মার্চ ১৯৮৭

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

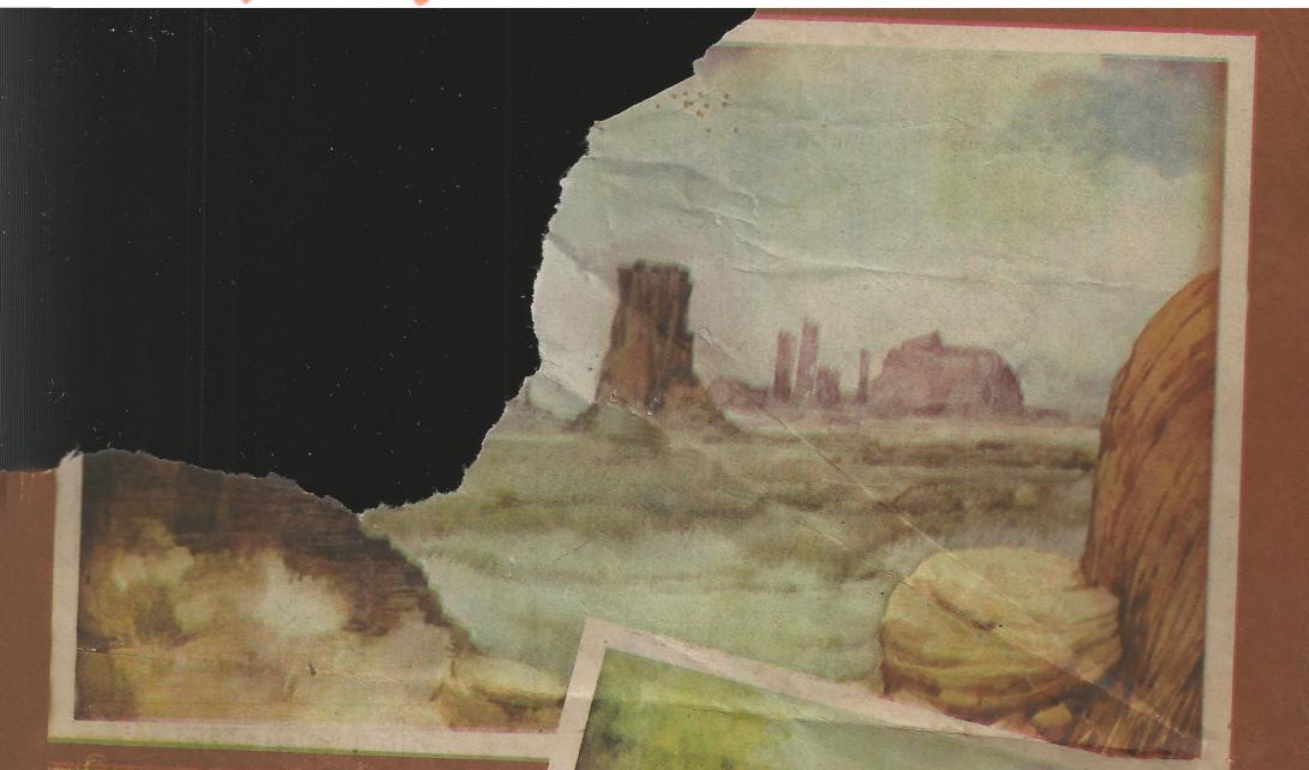

আরিজোনার মনুমেন্ট ভ্যালি-আমেরিকা

জলের স্রোতে গ্র্যানাইট পাথরের ক্ষয়

রোদ বৃষ্টিতে ক্ষয়ে
পাথর বিচিত্র আকার ধারণ করেছে।

চিঠিপত্র

বুদ্ধিশুদ্ধি ঃ উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে

জানুয়ারী '87 সংখ্যার 'কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান'-এ প্রকাশিত সমীর মণ্ডলের ধাঁধাটি বেশ মজার। ঐ ধাঁধার সমাধানকল্পেই এই চিঠ।

ছেলেটি বলছে—"শনিবার আর রবিবার স্কুল বন্ধ। সুতরাং সেগুলো এক সঙ্গে 104 দিন। বছরের লম্বা ছুটি 60 দিন।" অর্থাৎ 104 + 60 = 164 দিন। তার স্কুলে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। অতএব, মূলতঃ স্কুল চালু থাকছে (365 – 164) দিন = 201 দিন। ঐ 164 দিন সে না খেলো, না ঘুমলো, না খেলাধূলা করল সে সম্বন্ধে আমাদের বা বড়বাবুর কোনো দায় নেই!

যখন সে বলছে —'সারাবছর ঘুমের হিসেব হ'ল 8 × 365 = 2920 ঘণ্টা = 122 দিন', বা, '2 × 365 ঘণ্টা = 30 দিন মোটামুটি', বা '3 × 365 ঘণ্টা = 1095 45 দিন'—সেখানটাতেই যত গণ্ডগোল।

আগেই বলেছি তার খাওয়া-খেলা ঘুমানোর হিসেব হবে 201 দিনের মধ্যে। বাকী 164 দিনের সঙ্গে বড়বাবু এবং আমাদের আপাততঃ আড়ি।

দিনে সে 4 ঘণ্টা ঘুমোয় ; 3 ঘণ্টা খায় ; 2 ঘণ্টা খেলা করে (আদর্শ পড়ুয়া বটে !)। ∴ খাওয়া-দাওয়া বাবদ তার সময় লাগে 8 + 3 + 2 = 13 ঘণ্টা। তাহলে সে তো 24 – 13 = 11 ঘণ্টা সময় পড়াশুনা এবং স্কুল করবার জন্য পাচ্ছেই! তবে কেন সে বলছে যে—"স্কুলে আসার সময় কোথায় আমার ?" তার বক্তব্যে গোঁজামিলটুকু পাঠকবর্গ ধরতে পেরেছেন নিশ্চয়! বছরের লম্বা ছুটির দিন এবং শনিবার ও রবিবারগুলো সে হিসেবের মধ্যে বাদ দিয়েও বাদ দেয়নি। ভেতরের কথাটা কি জানেন ? তার দৃঢ় বিশ্বাস ঃ নেপো (নেপোলিয়ন) দিনে 3 ঘণ্টা ঘুমিয়ে যদি অতবড় হতে পেরেছে, তবে দিনে 8 ঘণ্টা ঘুমিয়ে সে নেপো না হোক্, ডেঁপো হতে পারবে নিশ্চয়!

আশা করি 'বুদ্ধিশুদ্ধি' ফিচারটি নিয়মিত চলবে।

সুমন্ত মুখার্জী
2A/30 মহিষ্কাপুর রোড, দুর্গাপুর-5, বর্ধমান

ভারতের গবেষণাগার

'ভারতের গবেষণাগার' ধারাবাহিক লেখায় বিমান বসু তাঁর 'টাটা ইনস্টিটিউট অফ্ ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ

"খুঁজে পাওয়া গেল 1983 সালে 'W' ও 'Z' নামক দুটি নতুন কণিকার রূপে। এই আবিষ্কারের জন্য ইতালীয় পদার্থবিজ্ঞানী কার্লো রুবিয়া পেলেন 1984 সালের নোবেল পুরস্কার।" [কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান, জুলাই 1986 পৃষ্ঠা 9]

প্রশ্ন হল 1984 সালের পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার কি অধ্যাপক কার্লো রুবিয়া একক ভাবে পেয়েছেন ? না, তিনি এই পুরস্কার একক ভাবে পান নি।

1984 সালের পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার অধ্যাপক কার্লো রুবিয়া এবং নেদারল্যাণ্ডের বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী সাইমন ভ্যান দার্ মেয়ার (Simon Van der Meer জন্ম 24 নভেম্বর 1925) কে যৌথভাবে প্রদান করা হয়েছে। অধ্যাপক ভ্যান দার্ মেয়ারকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে তাঁর "Stochastic beamcooling" আবিষ্কারের জন্য।

সহজে অঙ্ক কষা

আমি আপনাদের এই বহুল প্রচলিত জনপ্রিয় বিজ্ঞান পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন রচনা, প্রবন্ধ ছাত্রছাত্রীদের বিশেষভাবে সহায়তা করে। বিভিন্ন লেখকগণ এই পত্রিকা প্রকাশের প্রথম দিকে সহজে অঙ্ক করার কিছু পদ্ধতি শিখিয়েছিলেন। যেমন, উৎপাদক নির্ণয়ের সহজ পদ্ধতি, সমীকরণ সমাধান করার সহজ পদ্ধতি ইত্যাদি। এই লেখাগুলো মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের খুবই উপকারে লেগেছিল বলে আমার মনে হয়। ঐ ধরণের লেখা কিন্তু প্রকাশিত হচ্ছে না। আপনার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ এই যে আপনারা যদি 'সহজে অঙ্ক কষা' নামে একটা শাখা সৃষ্টি করে বিভিন্ন লেখককে দিয়ে লেখান তবে আমরা একসঙ্গে দারুণভাবে উপকৃত ও আনন্দিত হব।

সবশেষে এই পত্রিকার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি। নিবেদনান্তে

অমিত চক্রবর্তী, কুলগাছিয়া, হাওড়া

আবিষ্কারের গল্প

আমি একজন কিশোর-জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। 1986 এপ্রিল সংখ্যায় মৌল আবিষ্কারের পিছনে' দীপঙ্কর বসুর লেখা আবিষ্কারের গল্পে লেখক দুটি মৌলেরই একই নাম উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি ব্রিটেনের আবিষ্কার রেডিয়াম 1804) এবং দ্বিতীয়টি ফ্রান্সের রেডিয়াম (189৪)।

বলা বাহুল্য, এখানে দ্বিতীয়টি সঠিক এবং প্রথমটি ভুল। কারণ রেডিয়াম নামক যৌগটি আবিষ্কৃত হয় 1898 খ্রীষ্টাব্দে। সম্ভবত ঃ প্রথম মৌলটির নাম হবে রেডিয়াম।

বিদ্যুৎকুমার জোতিষ
কৃষ্ণপুর রবীন্দ্রপল্লী, উত্তর 24 পরগনা

অধ্যাপক রুবিয়া এবং ভ্যান দার্ মেয়ার উভয়েই জেনেভায় অবস্থিত ইউরোপীয়ান সেন্টার ফর নিউক্লিয়ার রিসার্চ (CERN নামে পরিচিত)-এর সঙ্গে যুক্ত।

সমীরকুমার সূত্রধর
শান্তিধাম কালীবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়, নিউ কলোনী, বঙাইগাওঁ-783380, আসাম

পাঠকদের প্রতি

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকার আগামী সংখ্যা বর্ষশেষ সংখ্যা। যে সব নতুন ফিচার শুরু হয়েছিল সেগুলি সম্পর্কে তোমাদের অভিমত এবং আগামী বছরে তোমরা কে কি রকম ফিচার পছদ করবে অবিলম্বে অভিমত দপ্তরে জানাও।

সম্পাদক ঃ কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

পর্যায় সরণী

"কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান" পত্রিকার অক্টোবর-নভেম্বর মাসে প্রকাশিত সুজিত দাসের চিঠির উত্তরে নিম্নের পর্যায় সরণী প্রকাশের জন্য পাঠালাম।

পদার্থ	প্রতীক চিহ্ন	এটোমিক নং	এটোমিক ওজন
Americium আমেরিসিয়াম	Am	95	(243)
Astatine আসটাটিন	At	85	(210)
Curium কুরিয়াম	Cm	96	(247)
Californium ক্যালিফোরনিয়াম	Cf	98	(251)
Kurcha Todium কুরচা টোডিয়াম	Ku	104	(259)
Cesium কাজিয়াম	Cs	55	(132·9055)
Neptunium নেপচুনিয়াম	Np	93	(237)
Plutonium প্লুটোনিয়াম	Pu	94	(244)
Promethium প্রমেথিয়াম	Pm	61	(145),
Ruthenium রুথেনিয়াম	Ru	50	(101 07)

জয়ন্ত মণ্ডল
গরলগাছা, হুগলী

"কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান চাই"

কোন পাঠক-পাঠিকা যদি 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান'-এর বিনিময়ে বাংলাদেশের কোন পত্র পত্রিকা পেতে ইচ্ছুক থাকেন তবে সেই পত্রিকার নাম ও আপনার ঠিকানাসহ নিম্ন ঠিকানায় পত্র দিয়ে জানাবেন।

মোঃ শফিকুল ইসলাম
26, আবুল খায়রাত রোড, আরমানিটোলা
ঢাকা-1 00, বাংলাদেশ

আমাদের এখানকার একটি পত্রিকা থেকে ভারতের এই জনপ্রিয় পত্রিকা 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান'-এর নাম জানতে পারলাম। আমার একান্ত ইচ্ছে এই পত্রিকা পড়ার। কিন্তু কিভাবে সংগ্রহ করবো বুঝতে পারছিনা।

যদি আপনি "কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান" পত্রিকার মাধ্যমে ভারতের পাঠক-পাঠিকাদের কে আমার বিষয়টি অবগত করেন, তাহলে তাঁরা হয়তো পত্রিকা বিনিময়ে আগ্রহী হবে/হবেন।

যদি কেউ আমাকে "কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান" পাঠায়/পাঠান তাহলে আমি তাকে বাংলাদেশের যে কোন পত্রিকা পাঠাবো।

তাই যদি আপনি অনুগ্রহ করে আমার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাতায় প্রকাশ করেন তবে খুবই খুশী হবো। ইতি—

অমর সূত্রধর, পোর্ট কলনী (উত্তর)
বাড়ী নং 282/এ, সড়ক নং 10, চট্টগ্রাম
বাংলাদেশ

অনুষ্ঠানে যোগদান করতে চাই

আমরা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকার বার্ষিক অনুষ্ঠানে যোগদান করতে চাই। অনুষ্ঠানের অগ্রিম সংবাদ কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাতায় প্রকাশিত হলে খুশি হব।

জয়ন্ত, মমতা, রবীন ইলা।
কৃষ্ণনগর, নদীয়া

বিচিত্র সংবাদ

কারখানার মালিক সাপ ?

সাধারণতঃ শ্রমিক ধর্মঘটের ফলে বাক্সমাগতলোক সানের ফলে কোনো কোন কারখানা বন্ধ হয়—এ কথা আমরা অনেকেই জানি। কিন্তু মাত্র একটা সাপের জন্য কারখানা বন্ধ হবার ঘটনাও ঘটেছে আমাদের দেশে। একদিন কোথা থেকে একটা বিরাট সাপ ঢুকে পড়লো এক কারখানার ভেতর। শুধু কারখানার ভেতরে ঢোকা নয় সেই বিরাট কেউটে সাপটা ঢুকে পড়লো কারখানার মালিকের ঘরে। মালিক ভদ্রলোক তো—বাপরে মারে বলে চেয়ার থেকে লাফিয়ে পড়ে দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। আর সেই সর্প মহারাজ সোজা মালিকের চেয়ারে গিয়ে শুয়ে পড়লো। যেন সে-ই এখন ঐ কারখানার মালিক। মাঝে মাঝে চেয়ারের ওপর ফণা তুলে ফোঁস ফাস শব্দ করতে লাগলো। আর তাই দেখে শ্রমিক কর্মচারী সবাই যে যেদিকে পারলো ছুটো পালালো। কেউটে সাপের শ্বাস প্রশ্বাসের আওয়াজে ভয়ে সকলেরই প্রায় আত্মারাম খাঁচা। কেউই আর কারখানায় ঢুকতে চায় না। এমন কি মালিক ভদ্রলোক তো নঃই। ফলে কারখানার গেটে তালা ঝুললো। কারখানা গেল বন্ধ হয়ে।

কুমীর পোষার খেসারত

বাড়িতে লোকে সখ করে কুকুর পোষে, বেড়াল পোষে, আরো অনেক গৃহপালিত জন্তু পোষে। কুমীর পোষার সখ কি কারো আছে? তাও আছে। বিষাক্ত মাকড়শা যখন কোনো দেশের লোক পুষছে, তখন কুমীর পোষাতে আশ্চর্য হবার কিছু আছে বলে মনে হয় না। তাছাড়া চিড়িয়াখানাতে তো কুমীর রাখা হয়। আর এই চিড়িয়াখানার কুমীর দেখে হয়তো অস্ট্রেলিয়ার এক কৃষকের হঠাৎ সখ হল কুমীর পুষবে। যা ভাবা তাই কাজ। কোথা থেকে এক কুমীর জোগাড় করে ঐ কৃষকটি বাড়িতে তার জন্য আলাদা জায়গা ও জলের ব্যবস্থা করে বেশ সগর্বে কুমীর পুষতে লাগলো। কুমীর দেখে ডেকে ডেকে সে তাকে খাবার দিত। কুমীরও খাবার খেয়ে বেশ নাদুস নুদুসটি হয়ে উঠলো। কৃষক ভাবলো—এবার কুমীরটা বেশ পোষ মেনেছে। তাই ঝুঁকে পড়ে একদিন কৃষক কুমীরটার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আদরের কুমীরটা সঙ্গে সঙ্গে তার ডান হাতটা ধারালো দাঁতে কেটে নিয়ে মুখের মধ্যে পুরে দিল।

—বরুণ মজুমদার

প্রতিযোগিতার খবর

স্টেট কাউন্সিল অব এডুকেশন্যাল রিসার্চ এণ্ড ট্রেনিং আয়োজিত

জাতীয় বিজ্ঞান প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতা 86-87

নবম থেকে দ্বাদশশ্রেণী পর্যন্ত পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য জাতীয় পর্যায়ে বিজ্ঞানপ্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন স্টেট কাউন্সিল অব এডুকেশন্যাল রিসার্চ এণ্ড টেনিং। 1000 থেকে 1200 শব্দের মধ্যে প্রবন্ধ রচনা করতে হবে। সৃজনশীল রচনা অর্থাৎ কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প রচনার ক্ষেত্রে মোট শব্দের কোন সীমাবদ্ধতা নেই। তবে নিম্নলিখি বিষয়গুলি থেকে যেকোন একটি বিষয় নির্বাচন করতে হবে

এক ঃ আঞ্চলিক কুসংস্কার এবং তার উৎস
দুই ঃ বিজ্ঞান কি আমাদের একতাবদ্ধ করে ?
তিন ঃ কেন শক্তি সঞ্চয় করব না ?

বিদ্যালয়ের/কলেজের নাম ঠিকানা সহ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের অনুমোদন সহ রচনাটি 31 মার্চ 1987 তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে নিম্নঠিকানায় ঃ

ড. দিলীপ কুমার সরকার, অ্যাসিস্ট্যাণ্ট প্রফেসর S. C. E. R. T, 25/3 বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড কলকাতা—19

জেলা পর্যায়ে সকল প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় সফল প্রতিযোগীকে যথাক্রমে Rs 250 Rs 100 ও Rs 50 পুরস্কার-স্বরূপ অর্পণ করা হবে। জেলা পর্যায়ে সফল প্রতিযোগীদের রাজ্য পর্যায়ে প্রতিযোগিতার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে। রাজ্য পর্যায়ে প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কারের পরিমাণ যথাক্রমে 1500 ও 1000 টাকা। রাজ্য পর্যায়ে সফল প্রতিযোগীগণকে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে। জাতীয় পর্যায়ে সকল প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী-গণকে যথাক্রমে 10,000, 5,000 ও 2000 টাকা পুরস্কার স্বরূপ অর্পন করা হবে। এ বিষয়ে আরও বিস্তৃত সংবাদের জন্য পূর্বে উল্লিখিত ঠিকানায় 60 প ডাকটিকিট যুক্ত খাম পাঠিয়ে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হয়েছে।

কম খাওয়া বেশি খাওয়া

সমরজিৎ কর

খাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে বিজ্ঞানীদের গবেষণার যেন শেষ নেই। অনেকে খেতে বসলে উঠতে চায় না। ভালমন্দ কিছু পেলে তো কথাই নেই। লোকে তাদের বলে পেটুক। নিয়মিত প্রয়োজনের বেশি খেলে শরীর মোটা হয়, কাজ করার ক্ষমতা কমে। আবার তোমাদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ আছ, খাবারের কথা উঠলেই একেবারে চুপ। মা কত রকম ভাল ভাল খাবার প্লেটে সাজিয়ে মুখের সামনে তুলে ধরে বললেন, খাও। অমনি উত্তর হল, না, খেতে ইচ্ছে করছে না, খিদে নেই। আর এইভাবে চলতে গিয়ে শরীর শীর্ণ হয়। কাজের ক্ষমতা কমে।

সত্যি কথা বলতে কি, এই খিদের ব্যাপারটা নিয়ে বিজ্ঞানীরা অনেক কাল ধরেই কিন্তু নানা রকম কথাবার্তা বলে আসছেন। যেমন ধরো, সুইজারল্যাণ্ডের জীববিজ্ঞানী হেলারের কথা। হেলার 1777 সালে একটি তত্ত্ব দাঁড় করান। এই তত্ত্বে বলা হয় খিদে পাকস্থলী সংক্রান্ত এক ধরনের অনুভূতি। এই অনুভূতি পাকস্থলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। আর তার উৎপত্তি ঘটে পাকস্থলীর মধ্যেকার এক ধরনের স্নায়ুর উদ্দীপনার দরুন। 1912 সাল পর্যন্ত হেলারের এই তত্ত্বটি চালু ছিল। এর পর শিকাগোর একজন চিকিৎসা-বিজ্ঞানী অ্যানটন কার্লসন আবিষ্কার করেন, দীর্ঘ উপোসের সময় পাকস্থলীর পেশী দ্রুত কম্পিত হয়, এবং সময় যত বাড়ে সেই সঙ্গে ওই কম্পনও বাড়ে। কার্লসন বলেন, এই কম্পনের অনুভূতি ভেনাস স্নায়ুর মাধ্যমে তলপেট থেকে গিয়ে পৌঁছায় মস্তিষ্কে। মস্তিষ্কের পেছন দিকে থাকে মেডুল্লা (medulla)। যেখান থেকে বেরিয়ে এসেছে এই সব স্নায়ু। এই মেডুল্লার মধ্যেই থাকে ক্ষুধা উদ্রেকারী অনুভূতির প্রাথমিক কেন্দ্রটি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কিছু আগে কামু এবং রোংসি নামক দুই ফরাসী বিজ্ঞানী অদ্ভুত একটি ব্যাপার আবিষ্কার করলেন। ইঁদুরের মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসের দুটি নির্দিষ্ট অংশ অস্ত্রোপচার করে তাঁরা দেখলেন, এর ফলে ইঁদুরের খাওয়ার ক্ষমতা প্রায় তিরিশ গুণ বেড়ে গেছে। এ নিয়ে ভারতেও কাজ হয়েছে। ভারতীয় শারীরবিজ্ঞানী বাল কে. আনন্দ হাইপোথ্যালামাসের ডান এবং বাঁ দিকের দুটি নির্দিষ্ট অংশে অস্ত্রোপচার করে বিনষ্ট করে লক্ষ্য করেন এতে করে ইঁদুরের খাওয়ার স্পৃহা কমে যায়। অর্থাৎ বোঝা গেল খিদে পাবে কি পাবে না, সেটা নির্ভর করে হাইপোথ্যালামাসের দুটি বিশেষ অঞ্চলের উপর—ওই দুটি অঞ্চল সক্রিয় হয়ে উঠলে খিদে পায়, সক্রিয় না হলে খিদে পায় না। এটাও দেখা গেল, এই দুটি অংশে যে কোষ থাকে তাদের কাজও বিচিত্র। এই বৈচিত্র্য মস্তিষ্কের আর কোথাও দেখা যায় না। রক্তের গ্লুকোজে কোষগুলি সাড়া দেয়। তাই এদের নাম দেওয়া হল 'গ্লুকোরিসেপটারস'। এছাড়াও এই কোষগুলি কোন কোন হরমোনের সংস্পর্শেও সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই হরমোনগুলির মধ্যে অন্যতম 'ইনস্যুলিন'। আরও একটি মজার ঘটনাও লক্ষ্য করলেন বিজ্ঞানীরা। রক্তের গ্লুকোজ যখন শরীরে ব্যবহৃত হতে থাকে, তখন আর খিদে পায় না। পাকস্থলীতেও চলে না সংকোচন এবং সম্প্রসারণ।

এর পর কত রকম পরীক্ষাই না হল। দেখা গেল, কোন কোন বস্তু শরীরের কোষকে গ্লুকোজ শোষণে বাধা দেয়। তখন খিদে বাড়ে। এও দেখা গেল, 'গ্লুকোরিসেপটরস' নামে এই কোষগুলি যদি নষ্ট করে ফেলা হয়—কোন ভারী ধাতুর সঙ্গে সংযুক্ত করে প্রাণীরা যেন অতিমাত্রায় খেতে থাকে এবং অল্প দিনের মধ্যে মুটিয়ে যায়।

এই মুটিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে আরও একটি ঘটনা দেখতে পেলেন বিজ্ঞানীরা। পরীক্ষাটি চালান হয় ইঁদুর খরগোস প্রভৃতির উপর। আর তা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করলেন মুটিয়ে যাওয়ার পেছনে কাজ করে দুটি কারণ। এক ঃ মস্তিষ্কের যে অংশটি খিদের উদ্রেক করে খাবার খেতে ইচ্ছে যোগায়, সেই অংশটিতে গোলযোগ ঘটলে খাওয়ার স্পৃহা বাড়ে। অস্ত্রোপচার করে এটি করা যেতে পারে। তখন অতিরিক্ত খেলে মুটিয়ে যেতে হয়। এ ধরনের মুটিয়ে যাওয়াকে বলে 'নিয়ন্ত্রণকারী মুটিয়ে যাওয়া।' দুই ঃ এমনও হতে পারে, হয়ত কোন কারণে শরীরে বিপাকীয় কাজকর্মে ঘটল গোলমাল। তখন অ্যাডিপোজ (adipose) কোষকলা বা চর্বি তৈরিকারক কোষকলা শরীরে অতিরিক্ত চর্বি তৈরি করতে থাকে। এতই চর্বি তৈরি করে যে, তা দ্রুত পুড়তে পারে না। অর্থাৎ শরীরে শক্তি সরবরাহের কাজে ব্যবহৃত হয় না। শরীরে তখন জমতে থাকে অতিরিক্ত চর্বি। দেহটি মুটিয়ে যায়। এ ধরনের মুটিয়ে যাওয়াকে বলে 'বিপজ্জনিত মুটিয়ে যাওয়া।'

বিপদ এই শেষের ব্যাপারটা নিয়ে। অনেক সময় দেখবে, তোমাদের মধ্যে অনেকে খায় কম, অথচ মুটিয়ে যাচ্ছে। অনেকে প্রচুর খেলেও দেহটি বেশ আঁটসাঁট এবং

সচল। প্রচুর খেয়েও যদি কেউ না মোটা হয়, ভয় নেই। কিন্তু সামান্য বেশি খেলেই বিপাকীয় গোলমালের দরুন যদি শরীর মুটোয়, ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াবে একবার ভেবে দেখ। এর মূলে কাজ করে বংশগতি। ক্রোমোজোমের মধ্যে থাকে 'জিন'। বাবা মা'র জিন সন্তানের দেহে আসে। জিনের মাধ্যমেই বাবা মা'র বহু বৈশিষ্ট্য সন্তানের দেহে হাজির হয়। মুটিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তা যে হয়, তারও প্রমাণ পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। দেখা গেছে বাবা অথবা মা, কিংবা উভয়েই যদি স্থূলকায় হন, তাঁদের ছেলেরাও অনেক ক্ষেত্রে স্থূলকায় হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন শহরে এ নিয়ে একটি সমীক্ষা চালান হয়েছিল। তাতে দেখা গেছে প্রতি একশ' জন শীর্ণকায় বাবা মা'র সাত শতাংশ সন্তান স্থূলকায় হয়। কিন্তু বাবা অথবা মা'র মধ্যে একজন যদি স্থূলকায় হয়, সে ক্ষেত্রে 40 শতাংশ সন্তানই হয় স্থূলকায়। আর বাবা মা উভয়ে স্থূলকায় হলে তাঁদের 80 শতাংশ সন্তান স্থূলকায় হয়। দেখা গেছে এর পেছনে খাদ্যাভাব নয়। বংশগতিই কাজ করে।

যাই হোক, মুটিয়ে গেলে যে ভয় পেতে হবে এমন কোন কথা নেই। পুষ্টি বিজ্ঞানীরা বলেন, একটু সতর্ক হলেই এই বিপদটি কিন্তু এড়িয়ে যাওয়া যায়। এর জন্যে তোমাদের যা করা দরকার তা হল—এক ঃ নিয়মিত দেহের ওজন নেওয়া উচিত। তোমাদের এখন বাড়ন্ত গড়ন। অতএব নিয়মিত শরীরের ওজন বাড়বেই। তবে সেই বৃদ্ধি যাতে অস্বাভাবিক না হয়, দেখতে হবে। দুই ঃ সুষম খাদ্য খেতে হবে। এবং পরিমিত। তিন ঃ নিয়মিত কোন না কোন ব্যায়াম করা দরকার। ভোরে উঠে কিছুক্ষণ হাঁটা, ফ্রি হ্যাণ্ড ব্যায়াম। ফুটবল, ভলিবল, ব্যাডমিণ্টন প্রভৃতি খেলা, সাঁতার কাটা, এই করলেই চলবে। এতে করে শরীরে অতিরিক্ত চর্বি পুড়বে, মুটিয়ে যাওয়ার ভয় থাকবে না। খিদে কম পাওয়ার পেছনেও কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ করে বংশগতি। এতে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। অনেক সময় দেখা যায়, পছন্দসই খাবার সামনে পড়লেই খেতে ইচ্ছা করে। যারা প্রয়োজনের তুলনায় কম খায়, তারা উপযুক্ত খাবার নির্বাচন করে নিতে পারো। এতে কাজ না হলে চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া দরকার। মনে রাখবে, খুব কম খেলে শরীর অপুষ্ট হয়। তার ফলে দেখা দিতে পারে নানা রোগ। কর্মক্ষমতাও কমে।

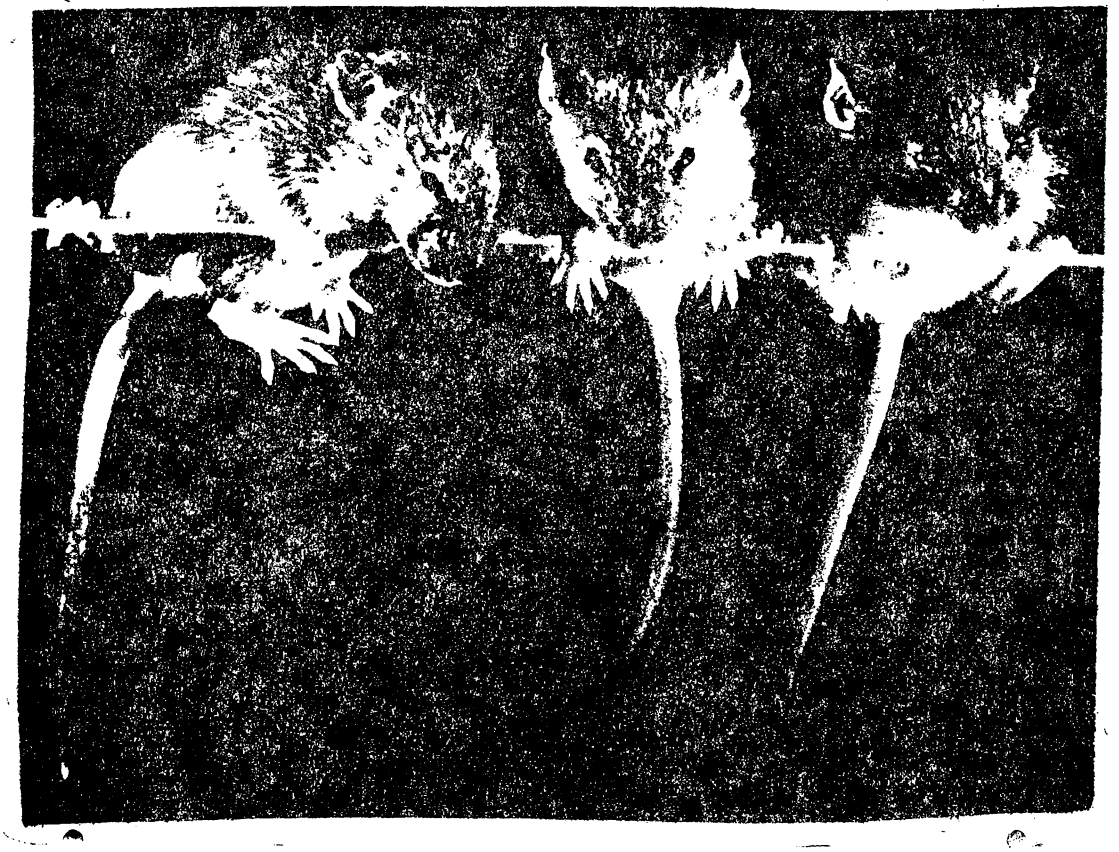

গন্ধবিচার

শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়

বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায়ের যে বিশিষ্ট কবিতাটির নাম ধার নিয়ে এই নিবন্ধের নামকরণ, সেই কবিতা মনে আছে তো ? তার দুই লাইন হল :

বললে রাজা, "মন্ত্রী, তোমার জামায় কেন গন্ধ ?
মন্ত্রী বলে. "এসেন্স দিচ্ছি—গন্ধ তো নয় মন্দ !"

তারপর সেই গন্ধ নিয়ে কতো কাণ্ড। শেষে গন্ধ শোঁকার বাহাদুরী দেখিয়ে বৃদ্ধ নাজির হাজার টাকা ইনাম পেল। আধুনিক কালেও কিন্তু এসেন্স নিয়ে কম কাণ্ড কারখানা চলছে না। আর যাঁরা পেশাদার গন্ধ-শুঁকিয়ে, মানে গন্ধদ্রব্য তৈরির শিল্পে যাঁরা গন্ধ বিচার করার দায়িত্বে থাকেন তাঁদের বাহাদুরীর কথাও জেনে রাখা ভালো।

আমাদের দেশে সুগন্ধী গন্ধদ্রব্যের ব্যবহার প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। লোধ্ররেণু, কাল-অগুরু ইত্যাদির উল্লেখ আছে কালিদাসের কাব্যে। নানা রকম সুগন্ধী ফুলের নির্যাস ব্যবহার করার উল্লেখ তিন হাজার বছর আগে মিশরীয় লিপিতেও পাওয়া যায়। কিন্তু এইসব সুগন্ধী তেল বা নির্যাস ছিল বহুমূল্য। তাই সাধারণ মানুষের সাধ হয় তো ছিল, কিন্তু সাধ্য ছিল না এইরকম বিলাসিতা করার। মাত্র 150 গ্রাম গোলাপের নির্যাস পেতে হলে 1000 কিলোগ্রাম টাটকা গোলাপের প্রয়োজন। সেই নির্যাসের দাম যে কতো হবে তার কিছুটা ধারণা করা যায় এর থেকে। আজকাল কিন্তু সুগন্ধী দ্রব্য (Perfume) সহজলভ্য হয়ে উঠেছে—যদিও খুব দামী সুগন্ধীও পাওয়া যায়। সীমিত দামের মধ্যে সুগন্ধী দ্রব্য সাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার কৃতিত্ব রসায়নবিদ্‌দের—যাঁরা কৃত্রিম উপায়ে বহুরকম সুগন্ধী তৈরির পন্থা উদ্ভাবন করে মূল্যমান জনগণের নাগালের মধ্যে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁরা রসায়নাগারে বিভিন্ন রকম উপাদান বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করে নতুন নতুন সুগন্ধের সৃষ্টি করছেন।

কস্তুরীমৃগের নাম শুনেছ তোমরা নিশ্চয়ই। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আছে—"পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি আপন গন্ধে মম, কস্তুরী মৃগসম।" হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে, তিব্বতের মালভূমিতে এই বিশেষ জাতের হরিণের বাস। কস্তুরী মৃগনাভির অদ্ভুত সুগন্ধের জন্যে সুগন্ধীদ্রব্য প্রস্তুতিতে এর বিপুল চাহিদা ছিল। সেজন্যে মানুষের বিলাসিতার বলি হিসেবে এদের নির্বিচারে এত শিকার করা হতো যে এরা অবলুপ্তির সম্মুখীন হয়েছিল। মাত্র 50 গ্রাম ভালো মৃগনাভির জন্যে চল্লিশ হাজার ডলার পর্যন্ত দাম উঠেছিল পঞ্চাশ বছর আগে ইওরোপের বাজারে। এখন কস্তুরীর গন্ধ কৃত্রিম উপায়ে তৈরি হচ্ছে বলে এই হরিণ অবলুপ্তির সম্ভাবনা কমেছে।

আধুনিক সুগন্ধীদ্রব্য (Perfume) তৈরির কারখানায় তিন ধরনের উপাদান লাগে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এগুলি সংগৃহীত হয়।

(ক) সুগন্ধী উপাদান : এর থেকে সুগন্ধের নির্যাস-গুলি পাওয়া যায়। একটি বিশেষ সুগন্ধী তৈরি করতে অনেকগুলি মৌলিক সুগন্ধের প্রয়োজন। তার মধ্যে কয়েকটি প্রকৃতিজ—যেমন টাটকা ফুলের নির্যাস, আবার কয়েকটি কৃত্রিম নির্যাস। ইদানিং কৃত্রিম নির্যাসের প্রচলনই বেশি কারণ এতে অল্প খরচে সমগুণের নির্যাস পাওয়া যায়।

(খ) ধারকদ্রব্য (Fixative) : এর গুণ হল অনেকগুলি সুগন্ধের মিলনে একটি বিশেষ সুগন্ধের সৃষ্টি, যা সহজে নষ্ট হয় না। আগেকার দিনে প্রাণিজ ধারক ব্যবহার করা হত। বিভিন্ন দেশ থেকে এই সব প্রাণিজ

ধারক আহরণ করা হত। বিশেষ তিনটি প্রাণিজ ধারক হল কস্তুরীর মৃগনাভি, ইথিওপিয়ার 'সিভেট' নামে বন-বিড়ালের শরীর থেকে প্রাপ্ত রস আর 'অ্যাম্বারগ্রিস্'—যা স্পার্ম তিমির পেটের ভেতর তৈরি হওয়া শক্ত চর্বির মতো জিনিস। সিভেটের গন্ধ খুব কটু, অথচ মিষ্ট গন্ধের ধারক হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়। আজকাল 'কস্তুরী' আর 'সিভেট' কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হচ্ছে।

(গ) বিশুদ্ধ গন্ধহীন অ্যালকোহল: এ জিনিসটির একমাত্র কাজ হচ্ছে নির্যাসের পরিমাণ বাড়িয়ে গন্ধ লঘু করা।

চন্দনকাঠের নির্যাসও বিদেশের রসায়নাগারে তৈরি হয়। পরিষ্কার জলে চন্দনকাঠের টুকরো বেশ করে ফোটানো হয়, আর ফুটন্ত জলের ওপর দিয়ে উচ্চ তাপে জলীয় বাষ্প পাঠানো হয়। চন্দনকাঠের তেল বাষ্পীভূত হয়ে জলীয় বাষ্পের সঙ্গে বেরিয়ে আসে। তারপর অন্য একটি শীতলীকৃত পাত্রে তরল অবস্থায় তা জমা হয়। চন্দন তেল জলের ওপর ভাসে বলে সহজেই পৃথক করে নেওয়া যায়।

দামী সুগন্ধী তৈরির কাজে কয়েকরকম ফুলের থেকে সংগ্রহ করা নির্যাস বা আতর ব্যবহার করা হয়। আতর সংগ্রহের পদ্ধতিটি সুপ্রাচীন। বিশেষ ধরনের চর্বির আবরণ দেওয়া বড়ো বড়ো কাঁচের পাত্রে টাটকা ফুলগুলি কিছুদিন রাখা হয়। এর ফলে চর্বির মধ্যে ফুলের নির্যাস মিশে যায়। তারপর বেনজিন বা অ্যালকোহল দিয়ে চর্বি থেকে নির্যাসটি পৃথক করা হয়। তারপর বেনজিন বা অ্যালকোহলকে পাতন করলে নির্যাসটি আলাদা হয়ে যায়।

তোমরা জেনে আশ্চর্য হবে যে—গোলাপ, যুঁই ইত্যাদির সুগন্ধ আজকাল কৃত্রিম উপায়ে যে মূল উপাদান থেকে সংগৃহীত হয়, সেটি হল 'আলকাতরা'। আলকাতরাকে 110 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে পাতন করে পাওয়া যায় 'টলুইন' যা থেকে দু রকম রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে পাওয়া যায় গোলাপ আর যুঁইফুলের কৃত্রিম নির্যাস। আর আলকাতরাকে 200 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পাতন করে পাওয়া যায় ক্রেয়সল্—যার থেকে তৈরি হয় 'কৃত্রিম কস্তুরী'।

বিজ্ঞান আর শিল্পকলার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে এই সুগন্ধী সৃষ্টিতে। বহু রকম ফুলের বা কস্তুরীর কৃত্রিম নির্যাস তৈরি যেমন রসায়ন বিজ্ঞানের অগ্রগতির পদচিহ্ন, বহু রকম সুগন্ধী উপাদান মিলিয়ে একটি নতুন সুগন্ধীর সৃষ্টি তেমনই বিশেষ এক শিল্পকর্ম। যেমন ধর, ফ্রান্সের বিখ্যাত একটি সুগন্ধী তৈরিতে মোট 16টি উপাদান লাগে। এর মধ্যে প্রকৃতিজ আর কৃত্রিম সুগন্ধী নির্যাস আছে 12 রকমের। বিখ্যাত চিত্রকর যেমন নানা রঙের সমন্বয়ে ছবি এঁকে একটি রসোত্তীর্ণ শিল্পসৃষ্টি করেন, সুগন্ধী বিশেষজ্ঞ তেমনই অনেক রকম নির্যাস বিভিন্ন মাত্রায় মিশিয়ে, উপযুক্ত ধারকদ্রব্য যোগ করে এমন একটি মনমাতানো সুগন্ধের সৃষ্টি করেন যা সহজেই লোকপ্রিয় হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে তাঁকে তিনটি বিশেষ দিকের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হয়।

(1) গন্ধটি শুধু মধুরই হবে না, একে হতে হবে মৃদু।
(2) সুগন্ধীটি যেন পোশাকে দাগ না ফেলে।
(3) এর গন্ধ যেন স্থায়ী হয়, সহজে মিলিয়ে না যায়।

সুগন্ধী দ্রব্যের বিশেষ ব্যবহার আছে টয়লেট সাবান তৈরিতে। তা ছাড়া বাথ্‌টবে ব্যবহার করার জন্যে সুগন্ধী বড়ি (Bath tablet) তৈরিতে আর সুইমিং পুলেও অনেক রকম সুগন্ধী ব্যবহার করা হয়। অনেক রকম শিল্পদ্রব্যের সহজাত কটুগন্ধ ঢাকার জন্যে, বা মৃদু সুগন্ধ যোগ করে বিক্রী বাড়ানোর জন্যে সুগন্ধী দ্রব্যের আজকাল খুব চাহিদা। রাবারের পুতুলে বা ব্যাগে এর ব্যবহার সুবিদিত। সুগন্ধী 'ইরেজার' (eraser) তো সবারই পরিচিত। ইউরোপে আর আমেরিকার অনেক জায়গায় পশুলোমের গরম পোষাক, মেয়েদের পোষাকে আর বিছানার চাদরেও মৃদু সুগন্ধী যোগ করে বাজারে ছাড়া হয়, কারণ দেখা গেছে ক্রেতারা এই রকম গন্ধযুক্ত জিনিস বেশি পছন্দ করেন। আবার বৈদ্যুতিক তারের আবরণে বিশেষ একটি সুগন্ধী লাগিয়ে সেই তার মাটির নিচে পাতলে ইঁদুর বা পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে তারটি রক্ষা পায়।

মিষ্ট গন্ধের প্রতি মানুষের আকর্ষণ সহজাত। আগে যা ছিল শুধু ধনী আর রাজপুরুষের প্রসাধনের উপচার, আজ তা সহজলভ্য এবং ব্যাপক তার ব্যবহার। মানুষের বিজ্ঞান ও শিল্পকলা হাতে হাত মিলিয়ে আজ নতুন নতুন সুগন্ধীর সৃষ্টিকর্মে নিয়োজিত হয়েছে।

পার্থসখা বন্দ্যোপাধ্যায়, ডিপার্টমেণ্ট অফ মেটালার্জি,
বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, হাওড়া।

ক্যুইজ কনটেস্ট

মার্চ 1987 মান : VI—VIII

1. এক হর্স পাওয়ার = কতো ওয়াট ?
2. O.N.G.C. সংক্ষিপ্ত নাম। পুরো নামটি কি ?
3. কাঁচির হাতল লম্বা হ'লে সুবিধা, না অসুবিধা হবে ?
4. M.K.S. পদ্ধতিতে 'বল'-এর এককের নাম কি ?
5. বারুদের উপাদান কি কি ?
6. 0·03 টাকা = কতো পয়সা ?
7. দুটি ভগ্নাংশের বিয়োগফল $1\frac{1}{8}$। এদের মধ্যে ছোটটি $\frac{1}{8}$ হ'লে বড়টি কতো হবে ?
8. 'ট্রাইফেরিক টেট্রক্সাইড' যৌগটির আণবিক সংকেত কি ?
9. ভিটামিন C-এর অপর নাম কি ?
10. নিচের রাশিগুলির মধ্যে কোন্‌টি ভেক্টর নয় ?
    (ক) বল (খ) সরণ (গ) চাপ
11. বর্ণালীর কোন্ কোন্ রং সালোক সংশ্লেষে অধিকতর উপযোগী ?
12. আমাদের চোখের লেন্সটি কেমন ?
    (ক) উত্তল (খ) অবতল (গ) উত্তল-অবতল।

ফটো ক্যুইজ

মার্চ 1987 মান : VI—VIII

সমুদ্রের বুকে ভেসে বেড়ানো লক্ষ লক্ষ উদ্ভিদ মিলে তৈরি হয় এই বস্তুটি। সামুদ্রিক প্রাণীদের খুব প্রিয় খাদ্য। নাম কি ?

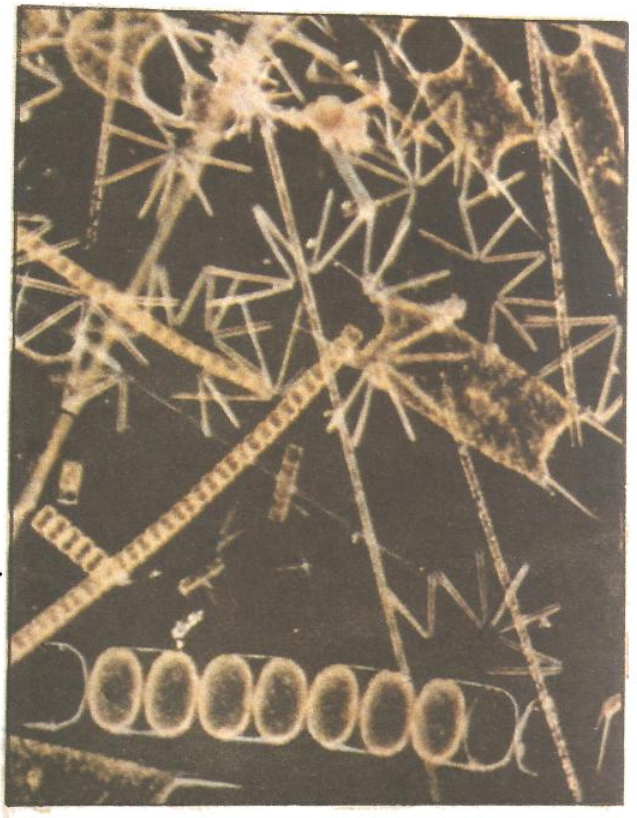

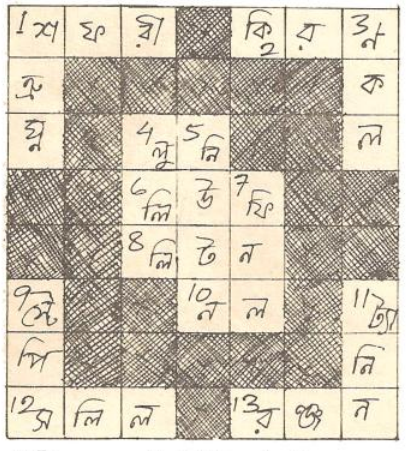

জানুয়ারী '87 আই-কিউ-টেস্টএর সমাধান

1. হীরাকুদ—অ্যালুমিনিয়ম, লুধিয়ানা—শীত বস্ত্র কেরল—কয়ার, মহীশূর—রেশম, উত্তর প্রদেশ—চামড়া, বিহার—অভ্র, আসাম—চা, 2. 800, 3. টাইম টেবিল, 4. (c) সোডিয়াম সালফেট, 5. (b) না

জানুয়ারি '87তে প্রকাশিত জুনিয়ার ক্যুইজ কনটেস্ট-এর সমাধান।

1. দিসপুর। শুটিং। 3. (খ) শুক্র। 4. গদাধর চট্টোপাধ্যায়। 5. চার শ্রেণীর। 6. ডুববে। 7. জৈব পদার্থ। 8. নীল। 9. অ্যামোনিয়া। 10. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 11. লণ্ডন। 12. নিউজিল্যাণ্ড।

জানুয়ারি সংখ্যার ফটো ক্যুইজের সমাধান : চৌরঙ্গী রোডে অবস্থিত টাটা সেণ্টার

ছোট আর বড়

প্রাণীবিচিত্রা

শৈল চক্রবর্তী

হরিণ যখন শিশু থাকে তখন তার গায়ে পোলকা ফুটকার বাহারে জামা। কিন্তু যেই বড় হল সেই বাহার চলে গেল।

মালয়দেশের টেপির পাঁচ ছয় মাস পর্যন্ত ছিটের জামা পরে থাকে। কিন্তু বড় হলে সে কারুকর্ম এইরকম বদলে যায়।

রূপবদলের ধারা বহু জীবের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। বাচ্চার নিরাপত্তার জন্য প্রকৃতির কি সুন্দর পরিকল্পনা!

জিপসাম

আজকের দিনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কণিকাগুলির একটি হলো 'জিপসাম'। শুধু প্লাস্টার অফ প্যারিস বা বিভিন্ন ধরনের প্লাস্টার তৈরিতেই নয়, সিমেণ্ট শিল্পে ও সার শিল্পেও জিপসাম অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। এই খনিজটির রাসায়নিক সংকেত হলো $CaSO_4 . 2H_2O$. এর মধ্যে ক্যালসিয়াম অক্সাইডের শতকরা পরিমাণ 32·5 ভাগ, সালফার ট্রাই অক্সাইডের পরিমাণ শতকরা 46 6 ভাগ এবং জল শতকরা 20 9 ভাগ। এর কেলাস মনোক্লিনিক গোষ্ঠীভুক্ত এবং সাধারণত প্রিজমের ন্যায় বা আয়তঘনাকার হয়। অবশ্য সূচাকৃতি, সূক্ষ্ম দানার আকৃতি এবং তন্তু আকৃতির জিপসামও পাওয়া যায়। এর কাঠিন্য কিন্তু হাতের নখের চেয়েও কম। মোজা (Moh's) স্কেলে এর কাঠিনা মাত্র 2. তাই নখ দিয়েও এর গায়ে দাগ কাটা যায়। জিপসাম স্বচ্ছ ও বর্ণহীন হয়, তবে সাদা, ধূসর, হলদেটে বা সবুজাভও হতে দেখা যায়। জিপসাম নামক খনিজটির একটি বিশেষ ধর্ম হলো—বেগুনী-পারের আলো দ্বারা একে উত্তেজিত করলে, এর কেলাস থেকে সবুজাভ আলো নির্গত হয়। পাললিক শিলাস্তরে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে জিপসাম পাওয়া যায়। এই খনিজটির উল্লেখ-যোগ্য ভাঁড়ার হলো ক্যালিফোর্নিয়া ; কলোরাডো, দক্ষিণ ডাকোটা, মিচিগান, নিউ মেক্সিকো, কানাডা, জার্মানী, পোল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া ও রাশিয়া। ভারতবর্ষে জিপসামের প্রধান ভাঁড়ারগুলি রাজস্থান, তামিলনাড়ু, জম্মু ও কাশ্মীর, উত্তরপ্রদেশ এবং গুজরাটে অবস্থিত। তবে রাজস্থানের জিপসামের ভাঁড়ারই আমাদের দেশে সবচেয়ে বড়। আমাদের চাহিদার শতকরা 70 ভাগ জিপসামই এখান থেকে মেটে।

সেরুসাইট

পৃথিবীতে সীসার ব্যবহার ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এই ধাতুটির একটি অন্যতম প্রধান আকরিক হলো সেরুসাইট। নামে অদ্ভুত হলেও এর রাসায়নিক সংযুক্তি কিন্তু খুবই সরল, $PbCO_3$. এই খনিজে সীসার পরিমাণ শতকরা 77·5 ভাগ। এর কেলাস সাধারণত দলবদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় আর এর যমজ কেলাসও (যেমন ছবিতে দেখানো হয়েছে) খুব সুন্দর দেখতে হয়। সেরুসাইট সাধারণত বর্ণহীন, সাদা বা ধূসর বর্ণের হয়। তবে অশুদ্ধি থাকলে ক্ষেত্রবিশেষে নীল, সবুজ বা কালো হওয়াও আশ্চর্য নয়। এর কেলাস কাচের মত, মুক্তোর মত কিংবা মোমের মত অধাতব দ্যুতিসম্পন্ন হয়। খনিজটি সাধারণত স্বচ্ছ হয়। এর একটি বিশেষত্ব হলো—একে বেগুনীপারের আলো দিয়ে উত্তেজিত করলে এর ভেতর থেকে হলুদ রঙের আলো নির্গত হতে থাকে। ভূতাত্ত্বিকদের মতে এটি একটি উপজাত শ্রেণীর মনিক, যা আকরিক ভাঁড়ারের জারণ অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। তামা, সীমা ও দস্তার অন্যান্য উপজাত শ্রেণীর মনিকের সাথে সেরুসাইট অবস্থান করে। অ্যারিজোনা, নিউ মেক্সিকো, কলোরাডো এবং দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও স্কটল্যাণ্ডে সেরুসাইট পাওয়া যায়। ভারতে সেরুসাইটের প্রাপ্তিস্থান হলো রাজস্থানের জাওয়ার খনি, অন্ধ্রপ্রদেশের অগ্নিগুণ্ডালা, উড়িষ্যার সরগীপল্লী অঞ্চল ও গুজরাট। আমাদের দেশের চাহিদা মেটাতে যে পরিমাণ সীসার প্রয়োজন হয় তার চেয়ে অনেক কম পরিমাণ সীসা উত্তোলিত হয় ভারতে। তাই বিদেশ থেকে ভারতে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণ সেরুসাইট আমদানী করা হয়।

অমরনাথ রায়

ক্যুইজ কনটেস্ট

মার্চ 1987 মান : IX—X

1. কোন্ খ্রীস্টাব্দে, কার আমলে ভারতে প্রথম রেলপথ ও টেলিগ্রাফ চালু হয় ?
2. এক ডিগ্রী দ্রাঘিমার পার্থক্যের জন্যে সময়ের পরিবর্তন হয় কতো ?
3. পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘতম বাঁধ কোন্‌টি ?
4. সি. জি এস্. পদ্ধতিতে 'ওহম-সেণ্টিমিটার' কিসের একক ?
5. হাইড্রোজেন অণুর গঠন কি রকম যোজ্যতার উদাহরণ ?
6. জলের মধ্যে একটি উভতল বায়ু বুদবুদ কোন্ রকম লেন্সের মতো ব্যবহার করবে ?
7. লোহার অভাবে উদ্ভিদের কোন্ রোগ হয় ?
8. যদি 11টার ঘণ্টা বাজতে 10 সেকেণ্ড সময় লাগে, তবে 9টার ঘণ্টা বাজতে কতো সময় লাগবে ?
9. নিচের কোন্ ক্ষেত্রে বায়ু চাপ সবচেয়ে বেশি হয় ? (ক) বায়ু গরম ও আর্দ্র থাকে (খ) ঠাণ্ডা এবং আর্দ্র থাকে (গ) ঠাণ্ডা এবং শুষ্ক থাকে।
10. কোন উষ্ণতার পাঠ সেলসিয়াস স্কেলে 25° হ'লে ফারেনহাইট স্কেলে তার পাঠ হবে নিচের কোন্‌টি ? (ক) 45° (খ) 77° (গ) 32°
11. একটি তারের ব্যাসার্ধ তিনগুণ করলে তার রোধ কতো গুণ হবে ?
12. মানুষের ডান ফুসফুসটি কয় খণ্ডে বিভক্ত ?

ফটো ক্যুইজ

মার্চ 1987 মান : IX—X

ছবি দেখে জন্তুটা উল্টে গেছে মনে কোর না। ছবিতে যেমন দেখছ, ঠিক সেইভাবেই হাঁটা চলার কায়দা এই বিচিত্র প্রাণীটির। নাম বলতে পারো ?

জানুয়ারি '87তে প্রকাশিত

সিনিয়ার ক্যুইজ কনটেস্ট-এর সমাধান।

1. কটকে। 2. মেথিলেটেড স্পিরিটে। 3. মহাভারত। 4. ওয়াটার গ্লাস। 5. 206টি। 6. Criminal Investigation Deparment. 7. প্রথম শ্রেণীর লিভার। 8. (খ) 1826 সালে। 9. হ্যারল্ড ইউরে। 10. প্রতি সেকেণ্ডে $1{\cdot}12 \times 10^6$ সেণ্টিমিটার। 11. মানুষের দেহের সর্ববৃহৎ গ্রন্থির (gland) নাম কি ? 12. পেঁয়াজ কি ধরনের কন্দ ?

ফটো ক্যুইজের সমাধান : ঈগল পাখি

আই-কিউ-টেস্ট—মার্চ '87

1. যদি RADIO শব্দটি 47 বোঝায়, তাহলে TELEVISION শব্দটি দ্বারা কোন সংখ্যাটি বোঝাবে—
(a) 75, (b) 80, (c) 130, (d) 150
2. হারানো সংখ্যাটি কত হবে বলো—0 2 8 18 ?
3. কোনটি বেমানান—
অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, অমৃতসর, আফ্রিকা
4. ভিটামিন C-এর অপর নাম কি ?
(a) ফরমিক অ্যাসিড, (b) অ্যাসকরবিক অ্যাসিড, (c) ল্যাকটিক অ্যাসিড 5. কোন ভারতীয় অ্যাথলিট প্রথম অর্জুন পুরস্কার লাভ করেন ?

অতিরিক্ত গণিতের আলোচনা

অসীম মুখোপাধ্যায়

অতিরিক্ত গণিতের ছাত্রছাত্রীরা মাধ্যমিক পরীক্ষায় অতিরিক্ত গণিতে ভাল নম্বর পাবে না কেন ? পাঠক্রম এবং বিগত কয়েক বছরের প্রশ্নপত্র পর্যালোচনা করে যে কোনো ছাত্র এখন একটি সুন্দর সম্ভাব্য প্র তালিকা প্রস্তুত করতে পারে যাতে অতিরিক্ত গণিতের যে কোনো পরীক্ষার্থী কমপক্ষে সহজেই ৬৫ নম্বরের মত উত্তর করতে সক্ষম হবে।

অতিরিক্ত গণিত সবার জন্য নয়। মনে পড়ে প্রায় চল্লিশ বছর আগের আমার ছাত্রাবস্থার কথা—আমি পড়তাম সাউথ সাবার্বন স্কুলে (ভবানীপুর)। আমাদের অতিরিক্ত গণিতের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক স্বর্গত বলরাম পাল মহাশয় প্রায়ই ক্লাসে বলতেন, Students of additional nathematics should be additionally gifted ; কথাটি সত্য। গণিতে একটু ব্যুৎপত্তি না থাকলে এ বিষয়টি অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে না নেওয়াই শ্রেয়। গণিতের প্রতি অনুরাগ থাকলে তবেই বিষয়টি গ্রহণ করা উচিত। বিষয়টির প্রতি নিষ্ঠার অভাব বা অনাদর প্রদর্শিত হলে, বিষয়টি আত্তীকরণে বাধার সৃষ্টি হয়। এমন একটি নিচ্ছিদ্র সারবান বহু শাখা-প্রশাখা সম্বলিত বিশাল বৃক্ষের সেবায় জীবন উৎসর্গ করার সৌভাগ্য খুব কম জনের ভাগ্যেই ঘটে।

এই নিবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো অতিরিক্ত গণিতের ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি পরিকল্পনার কিছু নির্দেশ দেওয়া। প্রথমেই বলা দরকার যে বিগত কয়েক বছরের প্রশ্নপত্রে দুটি বিভাগ থাকছে, একটি নতুন পাঠক্রমের এবং অপরটি পুরাতনের ; মাধ্যমিকের নিয়মিত ছাত্রছাত্রীরা পুরাতন পাঠক্রমের প্রশ্নের উত্তর করার অধিকারী নয়।

(1) সাধারণ বীজগণিত (নম্বর 20)

এই অংশে যে প্রশ্নগুলি প্রায়শঃই এসে থাকে সেগুলি হলো, চক্রক্রম উৎপাদকে বিশ্লেষণ, তিনটি অজ্ঞাত রাশির রৈখিক সহসমীকরণের সমাধান, একটি বা দুটি অজ্ঞাত রাশির দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধান এবং একটি লেখচিত্র অঙ্কন। এগুলি প্রস্তুত করা আদৌ কষ্টসাধ্য নয়। লেখচিত্র অঙ্কন সম্বন্ধে কিছু বলার আছে। ইদানীং অধিবৃত্ত এবং সরল-রেখার লেখচিত্রের অঙ্কনই পরীক্ষায় আসছে। অধিবৃত্তের শীর্ষবিন্দু এবং প্রতিসাম্য অক্ষটি নিরূপণের কৌশল জানা না থাকলে নিখুঁত লেখচিত্র অঙ্কন সম্ভব নয়। রেখা এবং অধিবৃত্তের (বা যে কোনোবৃত্তের) ছেদবিন্দু থেকে সংশ্লিষ্ট সমীকরণের সমাধান নির্ণয়ের পদ্ধতি জানা দরকার। অক্ষদ্বয়ের ওপর একই একক ধরতে হবে। অধিবৃত্ত বা অন্যান্য বৃত্তের ক্ষেত্রে গ্রাফ্-কাগজে স্থাপিত বিন্দুগুলি সরল রেখাংশ দ্বারা যুক্ত হবে না, পরন্তু মুক্ত হস্তাঙ্কিত অবিচ্ছিন্ন বক্র রেখা দ্বারা যুক্ত হবে।

(2) সেট বীজগণিত (নম্বর 20)

এই অংশে প্রস্তুত করা উচিত কিছু সংজ্ঞা, যেমন—সেট, সার্বিক সেট, শূন্যসেট, উপসেট, পূরক সেট ইত্যাদির সংজ্ঞা। এগুলির একটি করে উদাহরণ জেনে রাখা উচিত। নির্দিষ্ট সেটের মাধ্যমে সেট বীজগণিতের সূত্রগুলির প্রতিপাদন এবং ভেনচিত্রের সাহায্যে সূত্রগুলির প্রমাণ পরীক্ষায় আসতে পারে। সূত্রগুলির আনুষ্ঠানিক প্রমাণ পাঠক্রমে নেই। সমস্যাদির মধ্যে তিন ধরনের সমস্যা প্রস্তুতির মধ্যে রাখা উচিত—(ক) প্রদত্ত সেট থেকে সংযোগ, ছেদ ও অন্তর প্রভৃতি নির্ণয় (খ) সেট প্রক্রিয়ার সাহায্যে ল. সা. গু. এবং গ. সা. গু. নির্ণয় (গ) ভেনচিত্রের সাহায্যে সমস্যাদি সমাধান।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, সেটের পদসমূহ সর্বদা দ্বিতীয় বা অন্য কোনো বন্ধনীর মধ্যে লিখতে হবে এবং ভেনচিত্র সাহায্যে কোনো সমস্যা সমাধানের প্রশ্নে অন্য কোনো পদ্ধতি চলবে না। ভেনচিত্র সাহায্যে সমস্যা সমাধানের বিশেষ কৌশলটি লিখে রাখা উচিত।

(3) রাশি বিজ্ঞান (নম্বর 20)

বিচ্ছিন্ন বা শ্রেণীবদ্ধ পরিসংখ্যা বিভাজন থেকে যৌগিক গড়, মধ্যমা এবং ভূয়িষ্ঠক প্রভৃতি নির্ণয়ের একটি প্রশ্ন প্রায় বছরই থাকছে। তাই এগুলি প্রস্তুত করা অবশ্যই কর্তব্য। মনে রাখা দরকার যে শ্রেণীবদ্ধ পরিসংখ্যা বিভাজন থেকে মধ্যমা এবং ভূয়িষ্ঠক নির্ণয়ের জন্য প্রদত্ত শ্রেণীগুলিকে অবিচ্ছিন্ন করে নেওয়া অপরিহার্য এবং মধ্যমার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সারণীতে ক্রম যৌগিক পরিসংখ্যার স্তম্ভটিও অত্যাবশ্যক। উত্তরে একক উল্লেখ না থাকলে বা ভুল নম্বর কাটা যায়। পরিসংখ্যা বিভাজনের সারণী প্রস্তুতির সময় শ্রেণীগুলি বিচ্ছিন্ন বা অবিচ্ছিন্ন হবে কিনা তা ঠিক করতে হবে প্রশ্নের উপাত্ত বা তথ্যগুলি দেখে এবং সারণীতে টালিমার্ক স্তম্ভটি বা পৃথকভাবে তথ্যগুলির ক্রমানুসারে সাজানো অপরিহার্য। আয়তলেখ অঙ্কনের সময় শ্রেণীগুলিকে অবিচ্ছিন্ন করতে হবে এবং শ্রেণীগুলির দৈর্ঘ্য অসমান থাকলে পরিসংখ্যা

ঘনত্বের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যা নির্ণয় করতে হবে। অক্ষদ্বয়ে একক সহ শ্রেণী এবং পরিসংখ্য উল্লেখ করতে হবে। চিত্রটি হবে কতকগুলি পাশাপাশি অবিচ্ছিন্ন এবং আচ্ছাদিত আয়তক্ষেত্রের সমন্বয় এবং সর্বোপরি পরিচ্ছন্ন।

(4) সামতলিক জ্যামিতি (নম্বর 10)

পাঠক্রমে বিপরীত প্রতিজ্ঞাসহ মাত্র পাঁচটি উপপাদ্য আছে, এর মধ্যে প্রতি বছর দুটি আসে, একটি উত্তর করতে হয় এবং সংগে থাকে একটি অনুশীলনী। গতবছরের দুটি বাদ দিলে থাকে তিনটি, এর মধ্যে যে কোনো দুটি ভালমত পড়া থাকলে একটা অবশ্যই উত্তর করা যাবে। প্রাগ্রসর ছাত্র-ছাত্রীরা নিশ্চয়ই অনুশীলনীটি উত্তর করার মত নিজেকে প্রস্তুত করবে। আশা করা যায় যে অতিরিক্ত গণিতের ছাত্র-ছাত্রীরা জ্যামিতির উত্তর দানে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মত ভুলভ্রান্তি করবে না। জ্যামিতির উত্তরদানে সামগ্রিকভাবে ছাত্রছাত্রীরা কি সতর্কতা অবলম্বন করবে সে বিষয়ে কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের গত ফেব্রুয়ারী '87 সংখ্যায় প্রকাশিত বর্তমান লেখকের নিবন্ধটি পড়লে অতিরিক্ত গণিতের ছাত্রছাত্রীরাও উপকৃত হবে।

(5) ঘন জ্যামিতি (নম্বর 10)

এটির পাঠক্রমে আছে কিছু সংজ্ঞা, স্বতঃসিদ্ধ; তিনটি উপপাদ্য এবং সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী। গত বছরেরটি বাদ দিলে প্রস্তুতির জন্য থাকে মাত্র দুটি উপপাদ্য। গত কয়েক বছর কোনো অনুশীলনী প্রশ্নপত্রে না হলেও প্রাগ্রসর ছাত্রছাত্রীরা নিশ্চয়ই অনুশীলনী অভ্যাস করবে। প্রশ্নে প্রতি বছর কিছু সংজ্ঞা এসে থাকে, যেমন– নৈকতলীয় (অসামতলিক) রেখাদ্বয়, দ্বিলত কোন, অভিক্ষেপ ইত্যাদির সংজ্ঞা। 'Certaitn efisitions of Space Geometry শীর্ষক একটি নিবন্ধে বর্তমান লেখক অতিরিক্ত গণিতের যাবতীয় সংজ্ঞাগুলি সেট প্রতীকের মাধ্যমে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন। এটি Mathematics Today (প্রকাশস্থল H-2A, Green Park Extension, New Delhi-16) নামক একটি মাসিক পত্রিকায় জানুয়ারি '87 সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে; উৎসাহী ছাত্রছাত্রী এটি দেখতে পারো।

(6) রূপান্তর জ্যামিতি (নম্বর 20)

পাঠক্রমে আছে (ক) রূপান্তরের কতিপয় সংজ্ঞা (খ) বিভিন্ন রূপান্তরের সংযুক্তি এবং (গ) রূপান্তর জ্যামিতির প্রয়োগে আবশ্যিক গণিতের কতকগুলি উপপাদ্যের প্রমাণ।

(ক) সংজ্ঞাগুলি সমতলস্থ বিন্দু এবং তার প্রতিবিম্বের মাধ্যমে দিতে হবে, চিত্র নিষ্প্রয়োজন যদি না প্রশ্নে চাওয়া হয়। রূপান্তর জ্যামিতি কতিপয় সংজ্ঞা' শীর্ষক একটি নিবন্ধে মাধ্যমিক পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত যাবতীয় সংজ্ঞাগুলির আদর্শ উত্তর বর্তমান লেখক দিয়েছেন। উৎসাহী ছাত্রছাত্রী এই নিবন্ধটির জন্য 'অন্বেষা' বিজ্ঞান পত্রিকার (প্রাপ্তিস্থান—19 শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি—73) জানুয়ারী' 85 সংখ্যাটি দেখতে পারে।

(খ) রূপান্তর জ্যামিতির এই অংশটি একটু কঠিন। এই অংশে মোট চোদ্দটি উপপাদ্য আছে, তার মধ্যে সচরাচর যেগুলি পরীক্ষায় আসে সেগুলি হলো, দুটি প্রতিচ্ছেদী রেখা-প্রতিফলনের সংযুক্তি একটি ঘূর্ণন, বিভিন্ন বিন্দুতে দুটি অর্ধ-ঘূর্ণনের সংযুক্তি একটি চলন ইত্যাদি উপপাদ্য। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ (আর্য ম্যানসন, 6A রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলি—13) কর্তৃক প্রকাশিত 'গণিত চর্চার' জুন '86 সংখ্যায় মুদ্রিত বর্তমান লেখকের 'রেখা প্রতিফলনের কতিপয় সংযুক্তি' শীর্ষক নিবন্ধটি পাঠ করলে উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রীরা উপকৃত হবে।

(গ) এই অংশে আছে রূপান্তর জ্যামিতির মাধ্যমে মোট আটটি উপপাদ্যের প্রমাণ, যেমন—দুটি প্রতিচ্ছেদী রেখার বিপ্রতীপ কোণগুলি সমান, বাহু-কোণ-বাহু ও কোণ-বাহু-কোণ সংক্রান্ত ত্রিভুজের সর্বসমতার ওপর দুটি উপপাদ্য, দুটি রেখা সমান্তরাল হবে যদি এদের ভেদকদ্বারা উৎপন্ন অনুরূপ কোণদ্বয় সমান হয়, বৃত্তের সমান জ্যাসংক্রান্ত দুটি উপপাদ্য, সদৃশকোণী ত্রিভুজের অনুরূপ বাহুগুলি সমানুপাতী হয় ইত্যাদি। উল্লেখ্য রূপান্তর জ্যামিতির পাঠক্রমে কোনো অনুশীলনী নেই তবে সংজ্ঞাভিত্তিক সহজ প্রশ্ন পরীক্ষায় আসতে পারে। পাঠ্যপুস্তকগুলিতে প্রচুর অনুশীলনী থাকায় ছাত্রছাত্রীরা স্বাভাবিকভাবে বিভ্রান্তিতে পড়ে; বিশদ পাঠক্রম মধ্যশিক্ষাপর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত Curriculum and Syllabases পুস্তকটিতে (পৃ 371—390) পাওয়া যাবে, তাছাড়া সব পাঠ্য-পুস্তকের গোড়ার দিকে পাঠক্রমের তালিকা মুদ্রিত থাকে। উপপাদ্যগুলি প্রমাণের বিশেষ কৌশল আছে, কোনো রকমে দুটি চিত্র মিলিয়ে দিলেই হবে না, সংজ্ঞা এবং স্বতঃসিদ্ধ প্রভৃতির মাধ্যমে তা সম্পন্ন করতে হবে। প্রস্তুতির জন্য পাঁচ/ছটি নামী বিদ্যালয়ের নির্বাচনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সমাধান করে কোনো দক্ষ শিক্ষকের সহায়তায় সংশোধন করে নিলে, পরীক্ষার ভাল নম্বর পাওয়ার আর কোনো অন্তরায় থাকে না।

28/4/2/1B, শ্রীমোহন লেন, কলি-26

1987'র মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর জন্য

ঐচ্ছিক জীববিদ্যা : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

দিনোজ কুমার দে

1. শ্বসন কাহাকে বলে ? উদ্ভিদের কত প্রকার শ্বসন দেখা যায় ? শ্বসন কখন হয় ও কোথায় হয় ? প্রত্যেক প্রকার শ্বসনের রাসায়নিক সমীকরণ লিখ। উদ্ভিদ জগতে শ্বসনের তাৎপর্য কি ? চিত্রের সাহায্যে শ্বসনের একটি পরীক্ষা বর্ণনা কর। সালোকসংশ্লেষ কাহাকে বলে ? কোন্ অঙ্গে এবং কখন সালোকসংশ্লেষ হইয়া থাকে ?

2- বাষ্পমোচন কাহাকে বলে ? উদ্ভিদের জীবনে বাষ্পমোচনের প্রয়োজনীয়তা কি ? বাষ্পমোচন কত প্রকার ? চিত্রের সাহায্যে বাষ্পমোচনের একটি পরীক্ষা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

3. অঙ্কুরোদগম কাহাকে বলে ? এই প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি কি কি ? চিত্রের সাহায্যে একটি একবীজপত্রী ও একটি দ্বিবীজপত্রী বীজের অঙ্কুরোদগম বর্ণনা কর।

4. কাণ্ডের সাধারণ কার্যগুলি কি কি ? কয়েকটি পরিবর্তিত কাণ্ডের সচিত্র বিবরণ দিয়া উহাদের বিশেষ কার্যগুলি উল্লেখ কর।

5. পরাগযোগ কাহাকে বলে ? উদ্ভিদের জীবনে পরাগযোগের প্রয়োজন কেন ? পরাগযোগ কত প্রকার ? প্রত্যেক প্রকার পরাগযোগের সুবিধা ও অসুবিধা ব্যাখ্যা কর।

6. ফল ও বীজের বিস্তার বলিতে কি বুঝ ? উদ্ভিদজগতে উহার প্রয়োজনীয়তা কি ? বায়ু, প্রাণী ও জল দ্বারা ফল ও বীজের বিস্তার উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা কর।

7. চিত্রসহ একটি আদর্শ উদ্ভিদকোষ ও একটি আদর্শ প্রাণিকোষের পার্থক্য দেখাও। কোষের বিভিন্ন অংশের কার্য সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

8. মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। এই প্রকার কোষ বিভাজন উদ্ভিদের কোথায় হয় ?

9. একটি সরিষা গাছের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দাও। প্রতিটি অংশের কার্য উল্লেখ কর। কোন্ ঋতুতে সরিষার চাষ করা হয় ? সরিষা হইতে কি কি দ্রব্য পাওয়া যায় ?

10. একটি সম্পূর্ণ ফুলের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দাও। প্রতিটি অংশের কার্য উল্লেখ কর। ঐ ফুলের পরাগযোগ কিভাবে হয় ? অসম্পূর্ণ পুষ্প কাহাকে বলে ?

11. বীজপত্র কাহাকে বলে ? বীজপত্রের কার্য কি ? চিত্রসহ একটি একবীজপত্রী ও একটি দ্বিবীজপত্রী বীজের গঠন বর্ণনা কর। সস্যাল ও অসস্যাল বীজের একটি করিয়া উদাহরণ দাও।

12. প্রোথ্যালাস কাহাকে বলে ? ফার্নের প্রোথ্যালাসের গঠন চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর।

13. চিত্রসহ মিউকরের জীবনেতিহাস বর্ণনা কর।

14. মস কোন্ বিভাগের অন্তর্গত ? চিত্রের সাহায্যে মসের জীবন ইতিহাস ব্যাখ্যা কর।

15. নিম্নলিখিত উদ্ভিদগুলির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ :

a) কার্পাস, b) পাট, c) নারিকেল।

16. টীকা লিখ :

i) মূল ii) যৌগিকপত্র iii) শাখা iv) প্রোটোনিমা v) বিপরীত পরাগযোগ vi) যন্ত্র vii) সাইটোকাইনেসিস viii) জাইগোস্পোর ix) দ্বিনিষেক x) ধানগাছ xi) সস্য xii) স্পাইরোগাইরার অঙ্গজ কোষ।

17. প্রাণিজগতের প্রধান পর্বগুলির বর্ণনা দাও। প্রতিটি পর্বের একটি করিয়া উদাহরণ দাও।

18 অমেরুদণ্ডী ও মেরুদণ্ডী প্রাণীগুলির মধ্যে কি কি সাদৃশ্য ও কি কি বৈসাদৃশ্য দেখা যায় ? নিম্নলিখিত প্রাণীগুলি কোন্ কোন্ পর্বভুক্ত ?

i) তারামাছ ii) অ্যামিবা iii) স্পঞ্জ iv) অক্টোপাস v) ব্যাঙ vi) চিংড়ি vii) কেঁচো viii) হাইড্রা ix) বাদুড় x) যকৃৎকৃমি।

19. ব্যাঙ ও গিনিপিগের বহিরাকৃতির চিত্র অঙ্কন কর। উহাদের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

20. একটি মাছের চিত্র অঙ্কন করিয়া উহার দৈহিক গঠনে পরিবেশের প্রভাব ব্যাখ্যা কর।

21. ব্যাঙের পৌষ্টিকতন্ত্রের চিত্র অঙ্কন করিয়া প্রতিটি অংশের কার্য উল্লেখ কর।

22. ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডের চিত্র অঙ্কন করিয়া প্রতিটি অংশের বর্ণনা দাও। রক্ত সংবহনে উহাদের ভূমিকা কি ?

23. চিত্রের সাহায্যে টিকটিকির বহিরাকৃতির বিবরণ দাও।

24. চিত্রসহযোগে মশার জীবন ইতিহাস বর্ণনা কর। মশক বাহিত কয়েকটি রোগের নাম বল।

25. রূপান্তর বলিতে কি বোঝ ? চিত্রসহ কুনো-ব্যাঙের জীবন ইতিহাস অবলম্বনে রূপান্তর ব্যাখ্যা কর।

26. টীকা লিখ :—

i) মাছি ii) মধু iii) ব্যাঙের শ্বাসক্রিয়া iv) অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র v) কেঁচোর উপকারী ভূমিকা vi) ব্যাঙের শিকার ধরার পদ্ধতি vii) মূত্রাশয় viii) স্নায়ুতন্ত্র ix) শীতঘুম x) মাছের ফুলকা।

যে গ্যাস আগুন নেভায়

অমরনাথ রায় ও বিবেক রায়

বিখ্যাত ফ্লেমিশ বিজ্ঞানী জাঁ ব্যাপটিস্টা ভন্ হেলমণ্ট কাঠ এবং অন্যান্য কয়েকটি উদ্ভিজ্জ পদার্থ পুড়িয়ে 1630 খ্রীস্টাব্দে একটি যৌগিক গ্যাস আবিষ্কার করেন। তিনি গ্যাসটির নাম দিয়েছিলেন 'গ্যাস সিলভেস্টার'! বিজ্ঞানী ব্ল্যাক 1754 খ্রীস্টাব্দে ঐ গ্যাসটির নাম রাখেন 'স্থির বায়ু'। ফরাসী রসায়নবিদ অ্যান্টোয়াইন লরেন্ট—ল্যাভয়সিয়ে 1783 খ্রীস্টাব্দে প্রমাণ করেন যে 'গ্যাস সিলভেস্টার' বা 'স্থির বায়ু' আসলে কার্বন ও অক্সিজেনের একটি দ্বি-যোগ—যার অ্যাসিড ধর্ম আছে। তিনি তখন ঐ গ্যাসটির নাম রাখেন 'কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস' যা আজকাল কার্বন ডাই অক্সাইড' নামেই বেশি পরিচিত। প্রকৃতিতে বায়ুমণ্ডলে আয়তন হিসাবে প্রায় 0·03 ভাগ কার্বনডাই অক্সাইড গ্যাস আছে।

সাধারণ উষ্ণতায় মার্বেল পাথরের (ক্যালসিয়াম কার্বনেট) সঙ্গে লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। বাতাসের চেয়ে প্রায় দেড়গুণ ভারী বলে গ্যাসটিকে বায়ুর ঊর্ধ্বাপসারণ দ্বারা গ্যাসজারে সংগ্রহ করা হয়। মার্বেল পাথর থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস প্রস্তুত করার সময় লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহার করা হয় না। কারণ, লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড ও মার্বেল পাথরের বিক্রিয়ায় প্রথমে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হলেও সেই সঙ্গে অদ্রাব্য ক্যালসিয়াম সালফেটও গঠিত হয়। অদ্রাব্য ক্যালসিয়াম সালফেট মার্বেল পাথরের উপর একটি আস্তরণ সৃষ্টি করে। তার ফলে ঐ আস্তরণ মার্বেল পাথর ও অ্যাসিডের সংস্পর্শে ব্যাঘাত ঘটায়। ফলে বিক্রিয়ার প্রথম দিকে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস হলেও পরে গ্যাস নির্গমন বন্ধ হয়ে যায়।—এই কারণেই লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে মার্বেল পাথরের বিক্রিয়া ঘটিয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস প্রস্তুত করা হয় না। চুনাপাথর বা ক্যালসিয়াম কার্বনেটকে 1000 ডিগ্রী সেলসিয়াস উষ্ণতায় উত্তপ্ত করলে চুনাপাথর বিয়োজিত হয়ে গিয়ে পোড়াচুন বা ক্যালসিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন করে এবং সেই সঙ্গে উপজাত দ্রব্য হিসাবে পাওয়া যায় কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস। পেট্রোল, কাগজ, কাঠ, কয়লা ইত্যাদিকে বায়ুতে দহন করলেও কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়।

কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস বর্ণহীন এবং সামান্য অম্লস্বাদ-যুক্ত গ্যাসীয় পদার্থ। গ্যাসটি দাহ্য নয়, দহনের সহায়ক নয়, বিষাক্তও নয়, প্রাণীর শ্বাসকার্যে সহায়তাও করে না। গ্যাসটি জলে দ্রাব্য এবং সেই জলীয় দ্রবণ অম্লধর্মী। কস্টিক সোডার জলীয় দ্রবণে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস শোষিত হয়।

একখণ্ড জ্বলন্ত ম্যাগনেসিয়ামের ফিতাকে কার্বন ডাই অক্সাইড পূর্ণ গ্যাসজারে প্রবেশ করালে ম্যাগনেসিয়ামের ফিতাটি উজ্জ্বল শিখা সহ জ্বলতে থাকে। বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয় ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড ও কার্বন কণা। ম্যাগনে-সিয়ামের জ্বলনের সময় যে উষ্ণতার সৃষ্টি হয় তাতে কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বন কণা ও অক্সিজেনে বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়। তারফলে উৎপন্ন অক্সিজেনে ম্যাগনেসিয়াম ফিতা জ্বলতে থাকে। কার্বন ডাই অক্সাইডকে আগুন নেভাবার কাজে ব্যবহার করা হয়। কারণ ঃ এই গ্যাস বাতাসের চেয়ে ভারী এবং দহনের সহায়ক নয়। গ্যাসটি আগুনকে ঢেকে রেখে বাতাসের সঙ্গে আগুনের সংযোগ ছিন্ন করে দেয়। তার ফলে অক্সিজেন না পেয়ে আগুন নিভে যায়। স্বচ্ছ চুন জলের মধ্যে এই গ্যাসটি অল্পক্ষণ যাবৎ পরিচালনা করলে অদ্রাব্য ক্যালসিয়াম কার্বনেট উৎপন্ন হওয়ার দরুন স্বচ্ছ চুন-জল ঘোলা হয়ে যায়। কিন্তু বেশিক্ষণ যাবৎ যদি কার্বন ডাই অক্সাইড চালনা করা হয়, তাহলে অদ্রাব্য ক্যালসিয়াম কার্বনেট দ্রাব্য ক্যালসিয়াম বাই কার্বনেটে পরিণত হয়। ফলে ঘোলাটে চুন-জল আবার স্বচ্ছ হয়ে যায়। কঠিন কার্বন ডাই অক্সাইডকে বলা হয় 'ড্রাই-আইস' বা 'শুষ্ক বরফ'। 'শুষ্ক বরফ' হিমায়ক রূপে ব্যবহৃত হয়। বাতান্বিত জল (সোডা ওয়াটার, লেমোনেড ইত্যাদি) প্রস্তুতিতেও প্রচুর পরিমাণে এই গ্যাসটি ব্যবহৃত হয়। সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ খাদ্য প্রস্তুত করে। এই প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাই অক্সাইড একটি অপরিহার্য উপাদান। এই গ্যাসটি জলে দ্রবীভূত হয়ে কার্বনিক অ্যাসিড গঠন করে বলে একে কার্বনিক অ্যাসিডের নিরুদক (অ্যানহাইড্রাইড) বলা হয়।

অমরনাথ রায় প্রণীত

দুটি বইয়ের তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে

সংখ্যা নিয়ে খেলা ৮·০০ ॥ জ্ঞান বিজ্ঞানের মজার খেলা ১০·০০

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কলি-৯

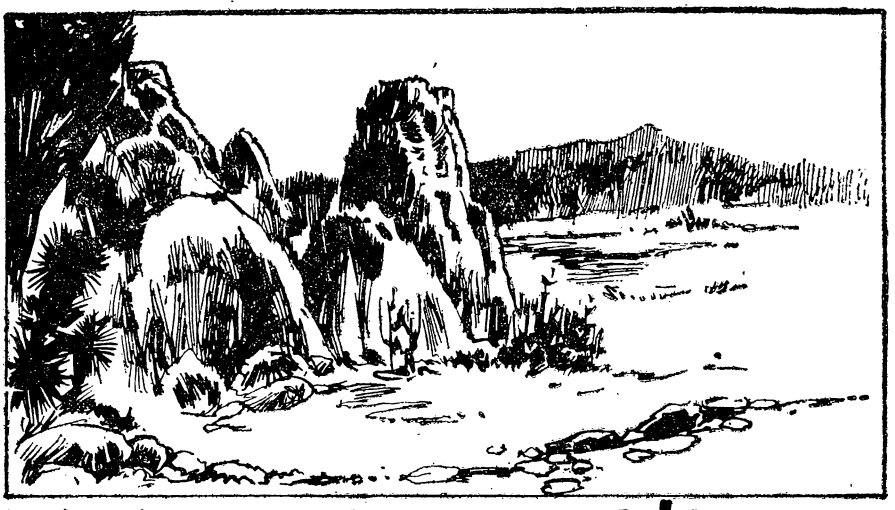

পাথরের জন্ম ও জন্মান্তর

মুক্তিপদ দাস

আমরা প্রত্যেকে কোনও না কোন পাথর দেখেছি। পাথর বা শিলা হল সেই বস্তু যা দিয়ে তৈরি আমাদের কঠিন ভূপৃষ্ঠ। সমতল অঞ্চলে যে মাটি এবং মরু অঞ্চলে যে বালুরাশি আমরা দেখতে পাই, তা হল পাথরেরই ভগ্নাবশেষ মাত্র এবং এই মাটি ও বালি দিয়ে ভূপৃষ্ঠের, বা বিশেষ করে তার নিচের ভূত্বকের (crust), খুব সামান্য অংশই গঠিত। প্রকৃতির জৈব ও অজৈব উভয় পদ্ধতিতে পাথরের জন্ম হয়। তবে জৈব পদ্ধতিতে উৎপন্ন পাথর যথা, কয়লা, জৈব চুনাপাথর, চার্ট ইত্যাদি —সংখ্যায় ও পরিমাণে পৃথিবীতে কম আছে। অজৈব পাথর দিয়েই প্রধানত ভূপৃষ্ঠ ও ভূত্বক গঠিত।

ভূপৃষ্ঠে যত রকম পাথর বা শিলা আছে, তাদের মোট তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—যথা, পাললিক (Sedimentary , আগ্নেয় (igneous), ও রূপান্তরিত (metamorphic) শিলা।

পৃথিবীর গভীর অভ্যন্তরে তাপমাত্রা এত বেশি যে, তার কোনও অংশে পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল থাকলে, পাথর তাপে গলে যায়। গলিত শিলা (magma) তরলের ধর্ম অনুযায়ী, ভূগর্ভস্থ ফাটল বা ঐ জাতীয় ফাঁক (fissure) বরাবর উপরের দিকে, অর্থাৎ কম চাপের জায়গায় উঠতে থাকে। অনুকূল পরিস্থিতির সুযোগ পেলে ঐ গলিত শিলা ভূপৃষ্ঠের শিলাস্তরের মধ্যে নিজের জায়গা করে নেয় এবং ক্রমশঃ শীতল ও ঘনীভূত হয়ে শক্ত আগ্নেয় শিলাতে পরিণত হয়। এইভাবে উৎপন্ন শিলাকে বলে অনুপ্রবেশী (intrusive) আগ্নেয় শিলা। কলকাতায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভবনে প্রধান ফটকের কাছে ব্যবহৃত গ্র্যানাইট (granite) হচ্ছে এই জাতীয় শিলা। কোনও কোন ক্ষেত্রে আবার গলিত শিলা আগ্নেয়গিরি বা ফাটলের মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠের ওপরে এসে তরলের আকারে প্রবাহিত হয় লাভা (lava) হিসাবে। এবং পরে তা স্তরে স্তরে জমাট বাঁধে। এসমস্ত পাথরকে বলে বহির্গামী (extrusive) আগ্নেয় শিলা। পীচ-রাস্তায় ব্যবহৃত কালোপাথর ব্যাসল্ট (basalt)-এর জন্ম হয় এই-ভাবে।

স্থলভাগের বেশির ভাগ অংশ জুড়ে রয়েছে পার্বত্য বা মালভূমি অঞ্চলের পাথুরে জায়গা। সেখানে খোলা আকাশের নিচে রোদ, বৃষ্টি, ভিজে হাওয়া, বরফ, উদ্ভিদ ইত্যাদির যান্ত্রিক ও রাসায়নিক প্রভাবে এই তিন শ্রেণীর যে কোনও পাথরেরই ধীরে ধীরে ধ্বংস (disintegration) হয়। অর্থাৎ, সোজা কথায় পাথর পচে যায় এবং তার জায়গায় পড়ে থাকে কাঁকুরে অবশেষ মাটি (residual Soil)। এই মাটি পার্বত্য বা উঁচু এলাকা থেকে, প্রথমে অসংখ্য ছোট ছোট নালা দিয়ে ও তারপর বড় নদীদ্বারা বয়ে নিম্নাঞ্চলে (basin) পলিমাটি (alluvieum) হিসাবে জমা হয়। নদীর স্রোত এই পলিমাটিকে বয়ে নিয়ে সমুদ্রতটেও জমা করে এবং সেখান থেকে ঐ মাটি ও বালি চলে যায় সমুদ্রের

অগভীর অংশের বিভিন্ন জায়গায়। এইভাবে পাথর থেকে মাটি, বালি ও পলি উৎপন্ন হয়ে ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে।

এর ফলে আমরা দেখতে পাই কোথাও রয়েছে পলিমাটির বিস্তীর্ণ উর্বর জমি—যেখানে চাষবাস হচ্ছে, কোথাও রয়েছে নদীর বা সমুদ্রের বালুচর, আবার কোথাও রয়েছে মরুভূমির বালুরাশি। এছাড়া, সমুদ্রতলে, বিশেষত উপকূলের অদূরে অগভীর অঞ্চলে রয়েছে বিপুল পরিমাণ বালি ও কাদামাটি। সমুদ্রে শামুক জাতীয় প্রাণীর খোলা (Shell) জলের ঢেউ ও স্রোতের দ্বারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে প্রচুর পরিমাণে সমুদ্রতলে জমা হয়। আবার অগভীর সমুদ্রে কোথাও কোথাও প্রবাল-জাতীয় প্রাণীর বিপুল জন-সমষ্টি (colony) দ্বীপাকারে জমা হয়! ভূপৃষ্ঠের নিম্নাঞ্চল গুলিতে (basin)—যেখানে ভূপৃষ্ঠ ক্রমশঃ নিচের দিকে বসে যেতে থাকে—এই সমস্ত বালি কাদা, জান্তবপদার্থ ইত্যাদি আলগা (loose) জিনিস স্তরে স্তরে বিপুল পরিমাণে জমা হয়। গভীর ভূগর্ভে তা পরে জমাট বেঁধে কঠিন পাললিক শিলায় পরিণত হয়। রাজস্থান ও তার আশেপাশে বহু ঐতিহাসিক স্থাপত্য যে লাল বেলে পাথর দিয়ে তৈরি তার উৎপত্তি এইভাবে জমাট বেঁধে।

পাললিক ও আগ্নেয় উভয় প্রকার শিলাই গভীর ভূগর্ভে তাপে ও চাপে এবং বিশেষতঃ যেখানে ভূগর্ভে আলোড়ন (earth movement)চলতে থাকে (যেমন হিমালয় ও তার আশে পাশের ভূমিকম্প-প্রবণ এলাকায়) এক প্রকার পাথরে থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির অপর প্রকার পাথরের রূপান্তর (metamorphism) ঘটে। কোনও ক্ষেত্রে পাথরে গঠন (structure), কখনও বা তার দানা-সমষ্টির বুনোট (texture), কিংবা তার খনিজ উপাদান (mineral composition) আমূল পরিবর্তিত হয়। এইভাবে চুনা পাথর মার্বেল পাথরে এবং কাদা পাথর (Shale) স্লেট (Slate) পাথরে রূপান্তরিত হয়।

এই যে আমরা দেখলাম পাথর থেকে মাটির উৎপত্তি, মাটি থেকে পুনরায় পাথরের জন্ম, এক প্রকার থেকে অন্য

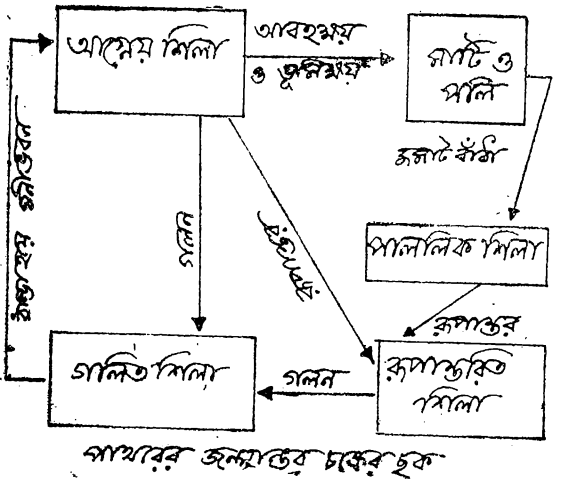

প্রকার পাথরের উদ্ভব, পাথর গলে গলিত শিলা থেকে পাথরের পুনর্জন্ম—এটা পৃথিবী-প্রকৃতির এক চক্রাকার নিয়মের ফল। শুধু তাই নয়, জড় পৃথিবীর শরীরের এই চক্রাকার নিয়মকে জীবন্ত মানুষের শরীরের রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। এই শিলা চক্র (rock cycle)-এর ফলে কোনও এক প্রকার পাথর পচে মাটি হয়। সে মাটি ধুয়ে স্রোতে নিম্নাঞ্চলে জমা হয় এবং গভীর ভূগর্ভে জমাট বেঁধে কোনও এক প্রকার পাললিক শিলাতে পরিণত হয়। সেই শিলা কালক্রমে রূপান্তরিত হয় অপর এক প্রকার পাথরে। তা আবার গভীর ভূগর্ভে গলে পরে ওপরে এসে ঠাণ্ডা হয়ে কোনও এক আগ্নেয় শিলা হিসাবে জন্মায়—যে শিলা ভূপৃষ্ঠে এসে কালক্রমে পচে আবার মাটিতে পরিণত হয়। কিন্তু মজার কথা হচ্ছে এই বিশাল পৃথিবীর মধ্যে কোনও এক বিশেষ রকমের (type) পাথর জন্মান্তরের চক্রে কখন আবার ঠিক একই পাথরে পুনর্জন্ম পাচ্ছে তার হদিস পাওয়া অতি দুরূহ ব্যাপার।

কেন্দ্রীয় খনি পরিকল্পনা ও নক্সা প্রতিষ্ঠান
1 নং আঞ্চলিক কার্যালয়, জি. টি. রোড (পশ্চিম) আসানসোল

সমরজিৎ কয়ের নতুন বিজ্ঞান গ্রন্থ

পরমাণু গবেষণায় ভারত

প্রকাশিত হয়েছে ॥ দাম ১০·০০

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড

মলিকিউলার কাফে

ইলিয়া ভারসভস্কি

অনুঃ- নিরঞ্জন সিংহ

(রাশিয়ান বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পের অনুবাদ)

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প-কাহিনী রাশিয়াতে খুবই জনপ্রিয়। 'মলিকিউলার কাফে'র লেখক ইলিয়া ভারসভস্কি খুব সম্প্রতি বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প লিখতে শুরু করলেও তিনি এখন একজন রাশিয়ার খুবই জনপ্রিয় বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প লেখক। বয়স পঞ্চাশের উপর, পেশায় ইঞ্জিনীয়ার। বিচিত্র অভিজ্ঞতার অধিকারী এই মানুষটির বুদ্ধিও ক্ষুরধার। এঁর গল্পগুলি খুবই সজীব ও বিপরীতার্থক। 'মলিকিউলার কাফে' গল্পে ভারসভস্কির সম্পূর্ণ দক্ষতার প্রকাশ না পেলেও লেখকের ধ্যান-ধারণার একটা স্পষ্ট প্রমাণ এখানে মেলে। রাশিয়ান ভাষা থেকে এ গল্প ইংরেজীতে প্রকাশ করেছেন মস্কোর মির পাবলিশার্স। ইংরেজী থেকে 'কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান'-এর জন্য ভাষান্তরিত করেছেন নিরঞ্জন সিংহ। সঃ]

কিশ্‌কার 'ইলেক্ট্রনিক বিহেভিয়ার অ্যানালাইজার' এর কাঁটা সারা সপ্তাহ ধরে 'অতি উত্তম' ঘরে স্থির হয়ে রইল। অর্থাৎ সারা সপ্তাহ মিশ্‌কা এতটুকু দুষ্টুমি করে নি, অতএব এ সপ্তাহের জন্য সে অতি উত্তম ছেলে। এরকম কদাচিৎ ঘটে। তাই এতবড় সুখবর উপলক্ষে আমরা ঠিক করলাম একটু আনন্দ করা উচিৎ।

মিশকার মা লিলি বলল, কনসার্ট শুনতে গেলে মন্দ হয় না। এখনকার কনসার্ট অবশ্য আগেকার দিনের মত বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে হয় না। এক ধরনের ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যে কনসার্ট শোনার অনুভূতি হয়। এই ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিকে বলা হয় 'ইনডিউসড্ সেনসেশানস্'। আমি বললাম, 'আমরা গন্ধ-যাদুঘরেও যেতে পারি।' কিন্তু মিশ্‌কা বলল, 'মলিকিউলার কাফেতে গেলে ক্ষতি কি ?'

আমরা মিশ্‌কার কথা মেনে নিলাম। কারণ সারা সপ্তাহ মিশ্‌কা ভাল ছেলে হিসেবে কাটিয়েছে বলেই তো আজ আমরা উৎসব করার সুযোগ পাচ্ছি। এ ক্ষেত্রে মিশকার কথা মানতেই হয়।

মলিকিউলার কাফেতে ঢুকে আমি একটা লাল টেবিলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। লিলি বলল, 'হাল্কা তেল থেকে তৈরি কৃত্রিম খাবারই ওর পছন্দ। ঘন তেল থেকে খাবার ওর মোটেই ভাল লাগে না।' আমি ওকে বললাম, 'কাগজে কিন্তু লিখেছে হাল্কা ও ঘন তেল থেকে তৈরি কৃত্রিম খাবারের মধ্যে কোন ফারাক নেই।' লিলি বলল, 'তা হতে পারে ; কিন্তু যখন আমরা আনন্দ করতে বেরিয়েছি তখন তর্ক না করে নিজের পছন্দমত খাবার খেতে আপত্তি কোথায় ?'

আমি তর্ক বন্ধ করে হাসলাম। লিলি খুশি হল। আমরা একটা সাদা টেবিলে গিয়ে বসলাম। বসার সঙ্গে সঙ্গে টিভির পর্দায় সাদা টুপি ও এ্যাপ্রন পরা রোবটের হাসিমুখ ভেসে উঠল। আমাদের উদ্দেশ্য করে বলতে শুরু করল ও, 'সুস্বাগতম্। মলিকিউলার সিনথিসিস কাফে তিনশ ষাট রকম পদ তৈরি করে আপনাদের মনোরঞ্জন করতে পারে। আপনার মনমত খাবার চাইবেন টেবিলে বসানো ডায়ালে খাবারের কোড নম্বর ডায়াল করে। মেনুতে ছাপানো খাবারের বাইরেও যদি আপনাদের কিছু খেতে ইচ্ছে করে তাহলে মাথায় পরার এ্যান্টেনা-টুপি পরে সেই খাবার সম্পর্কে গভীর ভাবে চিন্তা করলেই যন্ত্র সেই নতুন খাবার বানিয়ে দেবে।

আমি মিশ্‌কার দিকে তাকালাম। তাকিয়ে বুঝতে পারলাম ও যা খেতে চাইছে তা মেনুতে ছাপা নেই। লিলি ওর পছন্দমত খাবারের অর্ডার দিল। আমি চাইলাম কৃত্রিম কাটলেট। এই কাটলেট খুব দামী। লিলি ওর খাবার থেকে আদ্ধেকটা আমার প্লেটে তুলে দিল। আমার কাটলেট ভেঙে আদ্ধেকটা আমি লিলির প্লেটে তুলে দিলাম। যখন আমরা খাবার ভাগাভাগি করছিলাম সেই ফাঁকে মিশ্‌কা এ্যান্টেনা-টুপী মাথায় দিয়ে ওর কল্পনামত একটা খাবারের অর্ডার দিয়েছে। খাবার সার্ভও করে দিয়েছে। দেখলাম মিশ্‌কা ওর বিচিত্র খাবারের প্লেটের দিকে তাকিয়ে কাঁটাচামচ নাড়া-চাড়া করছে; সেই বিচিত্র খাবার খাওয়ার দিকে একটুও ওর মন নেই। মিশ্‌কা হয়তো ভাবছিল ওর কল্পনার এত সুন্দর খাবার বাস্তবে কী করে এত অখাদ্য হয়ে উঠল!

বেচারার জন্য আমার খুব কষ্ট হল। আমি ওর খাবারের প্লেটটা নিয়ে আবর্জনা সাফ করা যন্ত্রের মুখে ফেলে দিলাম। লিলি বলল, নতুন খাবার চাইলে খুব ভালভাবে মনঃসংযোগ করতে হয় তা না হলে যন্ত্র ঠিক চিন্তাটি ধরতে পারে না এবং এক খাবারের বদলে আর এক খাবার তৈরি করে ঝামেলায় ফেলে।

এরপর মিশ্‌কা একটা মহাকাশ যানের আকারের কেকের জন্য মনঃসংযোগ করল। আমিও এ্যান্টেনা-টুপিটা মাথায় পরে কল্পনা করতে শুরু করলাম যে আমার পানীয়ের স্বাদ হবে খুব দামী মদের মত। হঠাৎ একটা লাল আলো জ্বলে উঠল এবং টিভির পর্দায় রোবটটির মুখ ভেসে উঠল। আমাকে এক ধমক দিয়ে বলে উঠল, 'ওসব জিনিস এই কাফেতে সার্ভ করা হয় না।' লিলি আমার অবস্থা বুঝতে পেরে আমার হাতে চাপড় দিয়ে আমাকে ভরসা দিয়ে বলল, 'ভেব না। খাওয়া শেষ হলে আমি আর মিশ্‌কা বাড়ি চলে যাচ্ছি; তুমি গন্ধ-যাদুঘর ঘুরে যেও।' আসলে লিলি আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছিল। গন্ধ-যাদুঘরে গেলে ইচ্ছেমত মদের গন্ধ পাওয়া যায়। আমি বললাম, 'আরে না না, খাওয়ার পর বরং আমি আর মিশ্‌কা বাড়ি চলে যাচ্ছি; তুমি কনসার্ট শুনে বাড়ি ফিরো।' আমার কথা শুনে লিলি প্রস্তাব করল, 'তাহলে ওসব কিছু করার দরকার নেই, খাওয়ার পর আমরা সবাই বাড়ি ফিরে সন্ধেটা শান্তভাবে কাটাবোখন।'

লিলির প্রস্তাব বেশ ভালই লাগল। ওকে খুশি করার জন্য আমি একটা ফলের অর্ডার দিলাম। ফলটা দেখতে হবে কমলালেবুর মত, স্বাদ হবে আইসক্রীমের মত এবং গন্ধটা হবে লিলির খুবই প্রিয়। ফলটা আসতেই, লিলি খুশি হয়ে হাসল তারপর ওটায় কামড় বসালো।

বাড়ি যাওয়ার পথে লিলি বলল, 'এইসব কাফের খাবার-গুলোর স্বাদ খুবই ভাল। এই একই খাবার যখন বাড়ির কৃত্রিম খাবার বানানো যন্ত্রে তৈরি করা হয়, তখন খেতে এত ভাল হয় না।' আমার মনে হল সেন্ট্রাল সিনথেসাইজার থেকে তারের মাধ্যমে বাড়ির সিনথেসাইজারে ইমপালস্ আসার সময় নিশ্চয় কোন ডিসটার্বেন্সে খাবারের ইলেক্ট্রনিক সংকেতের সামান্য কিছু পরিবর্তন ঘটে তাই বাড়িতে তৈরি খাবারের মত এত স্বাদু হয় না।

বাড়ি ফিরে সেদিনই সন্ধেবেলা লিলি হঠাৎ কাঁদতে শুরু করল। কাঁদতে কাঁদতে যা বলল তার মানে হল কৃত্রিম খাবার একদম বাজে। এইসব ইলেক্ট্রনিকস্ যন্ত্রপাতি ওর দুচক্ষের বিষ। ও চলে যেতে চায় কোন সাদাসিধে গ্রামে যেখানে যন্ত্র এখনও ঘাবা গেড়ে বসতে পারে নি। সেই গ্রামে ও ছাগল পুষবে। খাঁটি ছাগলের দুধ দিয়ে রাই-এর রুটি খাবে। লিলি আরও বলল, কৃত্রিম কনসার্ট মানুষের অনুভূতির সঙ্গে এক ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা।

মিশকাও চিৎকার শুরু করে দিল। ওর বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে যে 'বিহেভিয়ার এ্যানালাইজার' একটি ঘৃণিত আবিষ্কার। বহুকাল আগে টম সয়ার বলে একটি ছোট ছেলে ছিল; তার সম্পর্কে মিশকা খুব উঁচু ধারণা পোষণ করে। সেই টম সয়ারের 'বিহেভিয়ার এ্যানালাইজার' ছিল না এবং তাতে তার এতটুকু ক্ষতি হয় নি। মিশকা আরও বলল যে, ও

(শেষাংশ 47 পৃষ্ঠায়)

খুদে বৈজ্ঞানিক

দিলীপ দাস

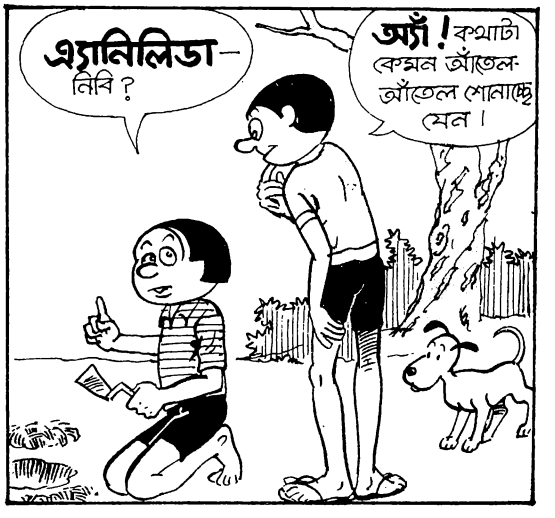

কৃষিক্ষেত্রে যখন এর ব্যবহার তাহলে তুই নিশ্চয়ই কোন সার-টারের কথা বলছিস, ঠিক কিনা ?

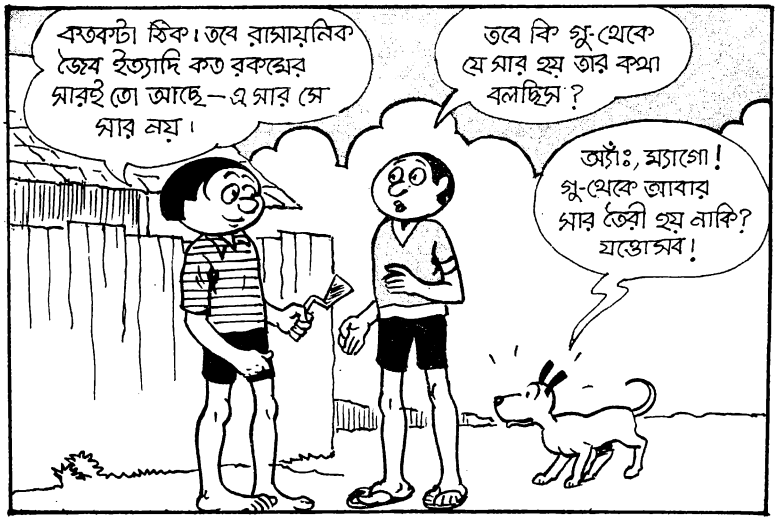
কতকটা ঠিক। তবে রাসায়নিক জৈব ইত্যাদি কত রকমের সারই তো আছে—এ সার সে সার নয়।
তবে কি গু-থেকে যে সার হয় তার কথা বলছিস ?
অ্যাঁঃ, ম্যাগো ! গু-থেকে আবার সার তৈরী হয় নাকি? যত্তোসব !

আরে সে তো গোল্ডেন ম্যানিউর। আর এ্যানিলিডা মাটিতেই হয়, এর জন্য কোন তকলিফ্ করতে হয় না। নে হাত পাত—
কেন ?

তোকে একটা এ্যানিলিডা দেব, তাহলেই সব ব্লিস্যার হবে।
দে - দেখি কি পদার্থ !
হুঁ, দেখি তো কি ধরনের সার !

ওরে বাবারে মারে গেলুম রে !
কি হলো ! ও অমন কুচিপুডি নৃত্য শুরু করলো কেন ? সার কই ?

থ্যি-থ্যি-থ্যি !

এটা কি হলো বল্লিক!
আমার হাতে পোকাটা দিলি কেন? যদি কামড়ে দিত!
কেন, তুই কি ভেবেছিলি মাটি খুঁড়ে আমি তোকে রসগোল্লা দেব?

এটাই সেই এ্যানিলিডা, চাষীদের বন্ধু।
কেঁ-চো!
কেঁচো। এত লোক থাকতে কেঁচো হল কিনা চাষির বন্ধু!

মাটির নীচেই কেঁচোদের বাস। এদের দেহ নিয়ত চলও অন্যান্য বস্তু মাটির পুষ্টি বাড়িয়ে তোলে এবং এদের সৃষ্ট গর্তও চাষের ক্ষেত্রে এক উপযুক্ত বাতাবরণ তৈরী করে গাছের উপকার করে।

এই কেঁচোর একটা ভাল বাংলা নাম আছে—অঙ্গুরীমাল। কারণ এর সমস্ত দেহটা আংটির মত রীং দিয়ে তৈরী।
উজবুক, প্রথমেই গোড়া গলদটা বাংলায় কেঁচো বললেই তো হতো। ঐ বিদঘুটে নাম আমার দাদু কোন দিন শোনেনি —আমি তো কোন ছার।
ঠিকই তো। অঙ্গুরীমাল বললেও খানিকটা আঁচ করা যেত।
MAR'87

বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় একে ঐ নামেই ডাকে। তোর দাদু ঠিকই জানেন, তুইই জানিস না। আর একটা কথা শুনে রাখ, জোঁকও কিন্তু ঐ একই গোত্রের।
থাক, দয়া করে ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করিস না। ও বড্ড ডেঞ্জারাস জীব

না-না, আমার গবেষণার বিষয় কেঁচো নিয়ে। সুতরাং ও ব্যাপারে তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পার। হ্যাঁ, যা বলছিলাম —
আর কিছু না বললেও চলবে, সব বুঝে গেছি।

ওকি; আবার অমন লাফালাফির কি হলো!
ওরে বাপরে! আমার পায়ের ওপর তোর ঐ এ্যানিলিডা উঠেছেরে। ধর ওটাকে!
ভীতুর ডিম! খামোখা ভয় পাচ্ছিস, এদের দাঁতও নেই চোখও নেই। মুখ যা আছে তা দিয়ে খালি মাটি আর পচা আবর্জনা খায়।
বুঝেছি, তোর মতন সাহসী মস্তান আর নেই! আপাতত ওটা চোখের সামনে থেকে সরা, গা ঘিন ঘিন করছে।
ওটা কিন্তু এক ধরনের এ্যালার্জি! থাক, তোর আর এ নিয়ে বেশী ঘাঁটাঘাঁটি না করাই ভাল।
এই সামান্য একটা কেঁচোকে ছুনোর এত ভয়! খ্যা-খ্যা-খ্যা আমার হাসি পাচ্ছে।
খ্যা — খ্যাঁৎ! কে-কি একটা পড়ল যেন!
ঝপাৎ
ও ম্যাগো, ও দাদুগো! এ কেঁচোটা এলো কোত্থেকে!
গ্রর-র-র-রৎ!
র-র-র-রৎ! উফ, বিচ্ছুটা গেছে!
যত্তোসব উটকো ঝামেলা! বন্ধুত্ব পাতাবার যেন আর কেউ পৃথিবীতে নেই খুদের যত উদভট্ কাণ্ড!

যোহান গ্রেগর মেন্ডেল

দিলীপ কুমার ঘোষ

রবি ঠাকুর বলেছেন "আশা যতোই বড়ো, ততোই বড়ো তার বাঁধা ভিতরে ও বাইরে।"—

22শে জুলাই, 1822 সাল। অস্ট্রিয়ার সাইলোসিয়ার এক নামহীন পল্লীতে বংশগতিবিদ্যার জনক 'যোহান গ্রেগর মেণ্ডেল' জন্মগ্রহণ করেন। কৃষক পরিবারের ছেলে যোহানের প্রাথমিক লেখাপড়ার শুভ সূচনা ঘটে 'হিন জেন ডর্ফ' গ্রামের এক পাঠশালায়। প্রাথমিক শিক্ষা শেষে বাড়ি থেকে 13 মাইল দূরে 'লেইপিঙ্ক' শহরের 'আপার এলিমেণ্টারী' স্কুলে মেণ্ডেলকে ভর্তি করে দেওয়া হল। এগারো বছরের কিশোর যোহান অন্তরে বিপুল আশা নিয়ে এই স্কুলে খুব পড়াশোনা চালিয়ে যেতে লাগলো। স্বীয় প্রতিভা বলে ইতিমধ্যে স্কুলে সেরা ছাত্রের আসনে উপবিষ্ট হল। এরপর তাকে পাঠান হল 'ট্রাপাউ' স্কুলে। স্কুল জীবনের যবনিকার পর্দা এই স্কুলেই নেমে এল।

শুরু হল কলেজ জীবনের এবং ভর্তি করানো হল 'জিমনেসিয়াম' কলেজে। 1840 সালে এখান থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করলেন। স্নাতক ডিগ্রী লাভের সাথে সাথেই কলেজ জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটলো। এবার উচ্চতর ডিগ্রী লাভের প্রয়োজন। উচ্চতর ডিগ্রী লাভের জন্য যে যোগ্যতার দরকার, তিনি তার অধিকারী। কিন্তু এর জন্য চাই প্রচুর অর্থ। যোহান পরিবারের সামর্থ্য নেই, অর্থ দিয়ে যোহানকে শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেবে। চিন্তায় যোহান ভেঙ্গে পড়লেন। কিন্তু হঠাৎ যোহানের মনে কৈশোরের স্বপ্নের উদয় হল। পরিশেষে অর্থ সংগ্রহের প্রত্যাশা নিয়ে গৃহ শিক্ষকের পেশা ধরলেন। অন্তরে গোপন বাসনা, অর্থ সংগ্রহ করতে পারলে পুনরায় শিক্ষাঙ্গনে ফিরে যাবেন। পরবর্তীতে তিনি Plmitz Philosophical Institute-এ ফিরে এলেন।

"যোহান শুনলাম তুমি পড়া ছেড়ে দিচ্ছ।"

"সম্ভবত তাই স্যার।"—উত্তর শুনে অধ্যাপক ফ্রানৎস দুঃখ পেলেন এবং ছাত্রের ব্যথায় তিনিও ব্যথিত হলেন। স্বর্ণকেশী সুশ্রী এই তরুণটিকে তিনি চিনতেন এবং ভালবাসতেন এবং তাঁর পারিবারিক অবস্থা সম্পর্কে জানতেন। তাই যথেষ্ট ভাবনায় পড়লেন পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ফ্রানৎস। যোহান বলে চলল—"পড়ার ইচ্ছে আমার খুবই স্যার। কিন্তু এখন দেখছি তা সম্ভব নয়। বাবা সুস্থ থাকলে হয়ত সম্ভব ছিল। কিন্তু গাছ থেকে পড়ে গিয়ে তিনি হঠাৎ বুকে আঘাত পান। সেই থেকে বাবা শয্যাশায়ী।" একটু থেমে সে আবার বলতে শুরু করল,—"বড়দির স্বামীই আমাদের দেখাশুনা করছেন। আমার পড়ার খরচ চালাতে তিনি অনিচ্ছুক। ছোট বোনের সাহায্য নিয়েই এখন পড়ছি। বোন 'থেরেসিয়াই' সাহায্য করছে। তার ভাবী বিয়ের প্রাপ্য যৌতুক সবই আমাকে দিয়েছে। শুধু তা দিয়ে একমাত্র দর্শন পড়াই আমার পক্ষে সম্ভব।" অধ্যাপক ফ্রানৎস গম্ভীর হলেন। ধৈর্য ধরে ছাত্রের একের পর এক বক্তব্য তিনি শুনলেন। এবং যোহানকে উদ্দেশ্য করে মৃদুস্বরে বললেন, "অন্তত তোমার পড়ার খরচ চালানোর মত অল্প স্বল্প আয় উপার্জন কি তোমার পক্ষে সম্ভব নয়, যোহান?"

"অবশ্যই তা সম্ভব ছিল। বেশ কিছুদিন ধরেই প্রাইভেট টিউশানি করে আসছি। আর বিশ্বাস করুন, তাতেই টিকে আছি। কিন্তু গত বৎসর থেকে শরীর যেভাবে ভেঙ্গে পড়েছে তাতে এ কষ্ট আর সহ্য করতে পারছি না স্যার।"

আশা-নিরাশার একটা জটিল দ্বন্দ্বে মুহূর্তে ঘুরপাক খেলেন অধ্যাপক ফ্রানৎস। সকলের অলক্ষ্যে অধ্যাপক ফ্রানৎস ভাবতে লাগলেন—না যোহান যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াটা অন্তত শেষ করতে পারতো তাহলে হয়ত উজ্জ্বল সম্ভাবনা তাতে থাকতো। বিদ্যুৎ চমকাবার মতো অধ্যাপক ফ্রানৎস হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন। স্নেহ-বিগলিত কণ্ঠে যোহানকে ডাকলেন এবং বললেন,"তুমি বরং গীর্জায় যাও। ব্রুনের অগাস্টিনিয়ান গীর্জায় আমার বন্ধু সিরিলনাপ সেখানকার প্রধান। তার কাছে তোমায় পাঠাচ্ছি। তিনি আমার কথা রাখবেন। সেখানে সম্ভবতঃ তুমি লেখাপড়ার সুযোগ পাবে। সংসারের দুশ্চিন্তার থেকে মুক্তিলাভের পথ খুঁজে পাবে। তোমাকে সেখানে পাঠাতে চাই। যোহান তুমি যাবে?" এমন তেজস্বী অথচ দরদ মাখা একান্ত ভালবাসা এবং অপ্রত্যাশিত ভাষা জীবনে যোহান কখনো কোনদিন শোনেননি। মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন জীবনে সাফল্য অর্জনে এ বন্ধুর পথে অবশ্যই পাড়ি দিতে হবে। অধ্যাপকের অন্তর ভরা স্নেহ আশীর্বাদ আর বুকভরা ভালবাসা নিয়ে তিনি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চললেন।

1843 সালের কথা। সে বছরের এক শিউলী ঝরা শরতের গোধূলিতে যোহান গীর্জায় এলেন। একুশ বছরের যোহান দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে ধর্ম দর্শন এবং একই সাথে বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের মাঝে নিজেকে ডুবিয়ে রাখলেন। যোহান যখন গীর্জায় পদার্পণ করলেন, তখন

প্রথানুসারে তাঁর নাম করা হল মেণ্ডেল্। এই গীর্জায় আসার পর যোহান আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন, কারণ গীর্জার মনোরম পরিবেশ ছিল তাঁর অনুকূলে। শুধু যে প্রাকৃতিক পরিবেশ তাঁর পক্ষে ছিল তা নয়। সেখানকার তাঁর নিত্য-দিনের সাথী অনেকেই ছিলেন প্রকৃতি বিজ্ঞানী, গণিতজ্ঞ, ধাতুবিদ, পদার্থবিদ ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানী। গীর্জার নিয়মানুসারে প্রত্যেককেই ধর্মীয় শিক্ষার সাথে সাথেই শি: কতাও করতে হত। অবসর সময়ে মেণ্ডেল গীর্জার বোটানিক্যাল গার্ডেনে ঘুরে বেড়াতেন এবং গীর্জার সংগ্রহশালায় সংগৃহীত খনিজ পদার্থ ও উদ্ভিদের নমুনাসমূহ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতেন।

1847 সালে যোহান যাজক পদে অধিষ্ঠিত হলেন। গীর্জার নিয়মানুসারে যোহানকেও শিক্ষকতার দিকে আসতে হল কিন্তু শিক্ষকতা করার যে যোগ্যতার প্রয়োজন অর্থাৎ 'একাডেমিক যোগ্যতা' তা তাঁর ছিল না। শিক্ষক হিসাবে যদিও যোহানের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। তথাপি এজন্য অপরিহার্য ডিগ্রীর। প্রয়োজনের তাগিদে প্রকৃতি বিজ্ঞান ও পদার্থ বিজ্ঞানে তাঁকে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে হল। কিন্তু পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারলেন না। তবুও তাঁকে মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচন করা হল। দুঃখের বিষয় ফলাফল তাঁর প্রতিকূলে গেল। অনিবার্য ব্যর্থতায় সিরিল ন্যাপ মেণ্ডেলকে পত্র দিয়ে ভার্সিটির কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠালেন। আনন্দের বিষয় কর্তৃপক্ষের সহানুভূতির দরুন ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর পড়ার সুযোগ হল। চার সেমিস্টার সেখানে পড়াশোনা করলেন। ভিয়েনা থেকে ফিরে এসে আবার তিনি শিক্ষকতায় যোগ দিলেন।

সালটি ছিল 1853। এই বছরে তিনি ভিয়েনার "প্রাণী ও উদ্ভিদ বিষয়ক সোসাইটি"র সদস্য নির্বাচিত হলেন। 1854 সালে তিনি মটর শুটির পোকা মটরের কি ক্ষতি করে সে সম্পর্কে এক গবেষণা পত্র ভিয়েনার ঐ সোসাইটিতে পাঠালেন। এটাই ছিল তাঁর জীবনের প্রথম গবেষণা। 1857 সাল থেকে শুরু করলেন মটর শুটির সংকরায়ণের পরে তাঁর মৌলিক গবেষণা। গীর্জার পাশেই ছিল খামার। খামারে শুধু তিনি মটর চাষ করতেন না। লতাগুল্ম ও মৌমাছির চাষও করতেন।

1862 সালের কথা। অখ্যাত ব্রুন শহরে যোহান সহ যোহানের কিছু সঙ্গী বিজ্ঞানোৎসাহীদের নিয়ে "ন্যাচারেল হিস্টি সোসাইটি" নামে একটি ক্ষুদ্র সংঘ গঠন করলেন। শহরটি ছিল যেমন অখ্যাত তেমনি অখ্যাত ছিল সংঘের প্রতিটি সঙ্গীরা। 1865 সালের 8ই ফেব্রুয়ারীর এক সন্ধ্যায় রোজকার মত এদিনও একত্র হয়েছেন, অনুসন্ধিৎসু আলাপী কয়েক বন্ধু। এদিন যোহান তাঁর গবেষণা সম্পর্কে মঞ্চে বিস্তারিত বর্ণনা করছেন। দুঃখের বিষয় অধিবেশনে উপবিষ্ট অধিকাংশ লোকেরা তাঁর বক্তৃতার দিকে নজর না দিয়ে কেউ কেউ ঘুমানোর চেষ্টায় রত, কেউ আবার গল্প করছে, কেউ বাইরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে অন্য চিন্তায় মগ্ন। আর যারা একটু আধটু শুনছে তারা আবার উদ্ভিদের সঙ্গে গণিতের কি সম্পর্ক এই চিন্তা করে পরিবেশটা অস্বস্তি মনে করতে লাগল। অবশেষে এদিন তিনি বক্তৃতা আর দিলেন না। তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন হয়ত বা তারা তাঁর বক্তব্য বুঝতে পারছে না। বাস্তবিকই সেদিন কোন বন্ধুই তাঁর বক্তব্য বুঝতে পারেনি। তারা অন্তরে ব্যথা পেল। তাঁরা ভাবল বহুদিনের পরিশ্রম তাঁর ব্যর্থ হল। কিন্তু যোহান মোটেই ভেংগে পড়লেন না। তিনি ভাবলেন এই সম্পর্কে আবারও তিনি ওদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করবেন। এই চিন্তা করে সেদিনের অধিবেশন সেখানেই ইতি টানলেন।

একই সালের কথা। কিন্তু তারিখটা 8ই মার্চ সকাল বেলা বসে আছেন। পুরনো স্মৃতি উদয় হল, একে একে তাঁর শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের অনেক কথা মনে পড়ে। নিভৃত অন্তরে হৃদয়ের উপচে পড়া বেদনাদায়ক স্মৃতির পুনারাবৃত্তি মুহূর্তে খেলা করে। মনে মনে ভাবেন বিজ্ঞানী, একদিন গীর্জার আশ্রয়ই ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। যাজকবৃত্তিতে তাঁর বেঁচে থাকার সংস্থান। আশ্চর্য, তাঁর তো যাজক হবার কথা জীবনে একটি বার ভ্রমেও কখনো মনে হয়নি! স্বপ্ন ছিল, তিনি শিক্ষক ও বিজ্ঞানী হবেন। শেষে হলেন যাজক। কঠোর বাস্তবের কশাঘাতকে অন্যের মত তিনিও তা হলে উপেক্ষা করতে পারেননি। বিনাশর্তে শেষপর্যন্ত ভাগ্যের হাতে তাঁকেও নিজেকে নিঃশব্দে সমর্পণ করে দিতে হল। পুরানো স্মৃতির মাঝে তাঁর গবেষণার কথা, মনে হল এবং ভাবলেন আজ সন্ধ্যায় আবার বন্ধুদের নিয়ে তাঁর গবেষণা নিয়ে আলোচনা করবেন। অবশেষে দুপুর গড়িয়ে বিকেল, তারপর এল সন্ধ্যা। একে একে অধিবেশনে নিমন্ত্রিত অতিথিরা নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট হলেন। মেণ্ডেল যথারীতি দ্বিতীয়বার বক্তৃতা দিলেন বটে কিন্তু আশ্চর্য এবারের ফলাফলও ঐ শূন্যের কোঠায়। উপস্থিত কোন লোকের কাছ থেকে স্বীকৃতি পেলেন না, এবার তিনি কিছুটা ভেংগে পড়লেন কিন্তু ভেংগে পড়লেও একেবারে নিরাশ হলেন না। তিনি ভাবলেন, এবার তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর নিবন্ধ পাঠাবেন। এবং এও ভাবলেন এমন একটি পত্রিকায় পাঠাব যে পত্রিকাটি দেশ বিদেশের প্রতিটি বিজ্ঞান ক্লাব, প্রতিটি গবেষণাগার এমনকি প্রতিটি লাইব্রেরীতেও যায়। তিনি ভাবলেন নিবন্ধ ছাপা হলে প্রশংসা না পান অন্তত সমালোচনাতো পাবেন। তাই তিনি "প্রসি-ডিংস অব দ্য ন্যাচারাল হিস্টি সোসাইটি" পত্রিকার উদ্দেশ্যে গবেষণাটি পাঠালেন। এবং যথারীতি 1866 সালের বিজ্ঞান পত্রিকার 8র্থ সংখ্যায় সেটা প্রকাশিত হয়। কিন্তু আশ্চর্য! তাঁর সে নিবন্ধ সম্পর্কে এতটুকু সমালোচনা কোথাও ধ্বনিত হল না। এতদিন পরে বিজ্ঞানী হাল ছাড়লেন।

তাঁর জীবনের সবকিছু মিথ্যা ভুয়ো প্রতিপন্ন হল।

কিন্তু না, এভাবে ভেংগে পড়া তাঁর পক্ষে হয়ত ঠিক হবে না। পদার্থবিদ্যার ক্লাস শেষে অধ্যাপক ফ্রানৎসের সাথে সেদিন তাঁর আলাপের কথা স্মরণ হল। অধ্যাপক তাঁকে কতই না ভালবাসতেন, আদর করতেন। যোহানের সম্পর্কে তাঁর কত না উচ্চাশা। তাঁর যোহান একদিন বড় হবে।মানুষ হবে। বিশ্বে তাঁর যোগ্যতার সুনাম ছড়িয়ে পড়বে। যোহান সম্পর্কে এমনি সব পত আশা অধ্যাপকের মনে। আজ সেসব কিছু তাঁর মুহূর্তের অবহেলায় নষ্ট হয়ে যাবে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সকলের অলক্ষ্যে গীর্জার পবিত্র সে ধূলিতে দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। তিনি বিস্মিত হন।

অধ্যাপক কার্ল ফুন নেগেলী মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত উদ্ভিদ বিজ্ঞানী, তাঁর কথা মেণ্ডেলের স্মরণ হয়। কিন্তু মেণ্ডেল জীবনে তাঁকে কোনদিন দেখেননি। স্থির করলেন গবেষণা সংক্রান্ত পত্রিকাটি তাঁকে পাঠিয়ে দেবেন। হয়ত সুরাহা তিনি করতে পারেন। বিশেষজ্ঞ তো। মেণ্ডেল মনে ভাবলেন। মেণ্ডেল ভাবলেন গবেষণাটি তো। পাঠাবেন কিন্তু নিজেকে কি পরিচয় দেবেন। অনেক ভেবেচিন্তে অবশেষে লিখলেন—"মহামান্যের একান্ত অনুগত ভৃত্য, গীর্জার যাজক ও শিক্ষক—ইত্যাদি।" প্রবন্ধ ও চিঠি 1865 সালের 31শে ডিসেম্বর নেগেলীর কাছে পাঠালেন।

যথাসময়ে নিবন্ধটি পেলেন নেগেলী সাহেব। অধ্যাপক সাহেব যতবার পড়লেন ততবারই তাঁর মনে হতে লাগলো এ উদ্ভিদ বিদ্যা ও বীজগণিতের এক জগাখিচুড়ী। অবশেষে তিনি মেণ্ডেলকে লিখলেন—"মটর শুটী সংক্রান্ত আপনার গবেষণা নিবন্ধ পড়ে আমার মনে হচ্ছে এ কেবল শুরু মাত্র, —এ শেষ হতে অনেক দেরী, ইত্যাদি।" আসলে অধ্যাপক সাহেব নিজেই এ সম্পর্কে বুঝে উঠতে পারেননি। তাঁর ধারণা গণিত গণিতই, উদ্ভিদ বিদ্যা উদ্ভিদ বিদ্যাই, এদের ভিতর আবার সম্পর্কের লেজুড় কেন? মেণ্ডেলের জীবনে এর পরবর্তী অধ্যায় যদিও ছোট, তবুও তা করুণ, আরো ভয়াবহ। তাঁর দীর্ঘ সাধনা যেখানে প্রকাশের বেদনায় সকলের অলক্ষ্যে ছট্‌ফট্‌ করছে বিজ্ঞানীকে সেখানে আগামী দিনের স্বর্ণোজ্জ্বল শুভ মুহূর্তের কথা ভেবে নিরবে অশ্রু সংবরণ করতে হচ্ছে; এটাই ভাগ্যের নির্মম পরিহাস!

1884 সালের 6ই জানুয়ারী। সেদিনটিতে মেণ্ডেলের মৃত্যু হল। পৃথিবীর মানুষের একরূপ অবহেলা আর নিজের জীবনের অপরিসীম ব্যর্থতা নিয়ে তিনি বিদায় নিলেন। —এই পাখি ডাকা তরুলতা বেষ্টিত সূর্যকরোজ্জ্বল মায়াবী ভুবন থেকে।

ভাবতে অবাক লাগে বিশ্বনন্দিত বিজ্ঞানী অধ্যাপক নেগেলী মেণ্ডেলের গবেষণাকে একেবারে জগাখিচুড়ী বলে মন্তব্য করেন অথচ মেণ্ডেলের মৃত্যু বর্ষে নেগেলীর বিবর্তন সংক্রান্ত গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। তাতে উল্লেখিত কিছু কিছু তথ্য মেণ্ডেলের গবেষণার সাথে অতি ঘনিষ্ঠ ছিল অথচ মেণ্ডেলের নাম বইয়ের কোথাও ছিল না।

1900 সালের ঘটনা। হল্যাণ্ডের নেদারল্যাণ্ডবাসী প্রখ্যাত অধ্যাপক জীববিজ্ঞানী হুগো, ডি ভ্রিসের "দ্য ল অব স্পিল্টিং অব হাইব্রিডস" প্যারিস বিজ্ঞানী একাডেমীর মুখপত্র ও জার্মান বোটানিক্যাল সোসাইটির রিপোর্টে একই সাথে প্রকাশিত হয়। এ গবেষণায় বিশেষ লক্ষণীয় যে গবেষণার প্রথমে ভ্রীস সাহেব লিখেছিলেন,—"মেণ্ডেলের মূল্যবান নিবন্ধের কথা খুব কমই বর্তমানে উচ্চারিত হয়। আমি নিজেও এ বিষয়ে গবেষণা শেষ না করা অবধি এ সম্পর্কে একেবারে অনবহিত ছিলাম। সুতরাং একথা আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি প্রদত্ত নিবন্ধের সিদ্ধান্তসমূহ একান্ত ভাবে আমার নিজস্ব"।

পরবর্তী ঘটনা। উল্লেখিত জার্মান বোটানিক্যাল সোসাইটির রিপোর্টে প্রায় একই সাথে প্রকাশিত হল আরও দুটি নিবন্ধ। প্রথমই হচ্ছে, জার্মানবাসী কার্ল করেন্সের "গ্রেগর মেণ্ডেল'স রুলস কনসার্নিং দ্য বিহেভিয়ার অব রেশিয়াল হাইব্রিডস।" দ্বিতীয়টি হচ্ছে ইরিখ শেরমার্কের "অন আর্টিফিসিয়াল ক্রসিং অব পাইসাম স্যাটিভাম"। ইরিখ শেরমার্ক ছিলেন একজন অস্ট্রীয় জীববিজ্ঞানী। উভয়ের কথা—"আমাদের গবেষণা শেষ করার পরই আমরা শুধু মেণ্ডেলের নিবন্ধের খোঁজ পেয়েছি। 46 পৃষ্ঠা ব্যাপী প্রকাশিত তাঁর গবেষণা পত্রটি আমরা পড়েছি। আশ্চর্য! যে কথা আজ আমাদের কাছে এতদিন পরে ধরা পড়েছে, তাঁর সম্পর্কে পূর্বেই সঠিক ধারণা দিতে সমর্থ হয়েছেন গীর্জার আশ্রয়ভুক্ত গ্রেগর মেণ্ডেল।"

আর এভাবেই মেণ্ডেল জগৎ সমক্ষে পুনরাবিষ্কৃত হলেন। আজ আমরা শ্রদ্ধেয় এই তিন বিজ্ঞানীর কাছে কৃতজ্ঞ। বস্তুত মেণ্ডেলকে তাঁর অনন্যসাধারণ অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য যেমন কোনদিন ভুলবো না, তেমনি এই তিন জীববিজ্ঞানীকে তাঁদের স্ব স্ব ভূমিকার উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব সংস্থাপনের জন্য কখনো বিস্মৃত হব না। গীর্জাধ্যক্ষ মেণ্ডেল মানবতাকে উপহার দিয়েছেন এক নতুন সার্বজনীন বিজ্ঞান। দুর্ভাগ্য তিনি তা জেনে যেতে পারেননি।

সংগ্রহ সূত্রঃ—বিভিন্ন বই ও পত্রিকা।

C/o নিতাই চন্দ্র ঘোষ, গ্রাম—আট্টাকী, পোঃ—ফকিরহাট, জেলা—খুলনা, বাংলাদেশ।

মশলার রাজা গোলমরিচ

সন্দীপ সেন

সমস্ত মশলাই উদ্ভিদ থেকে পাওয়া যায়। এগুলি খাদ্যের সাথে যুক্ত হয়ে খাদ্যকে স্বাদযুক্ত, সুগন্ধী এবং পাচনের উপযোগী করে। যদিও অতিরিক্ত মশলাযুক্ত খাবার খাদ্যকে বিষাক্ত করে এবং সব মশলাই পুষ্টিকারক নয়।

গোলমরিচ (Black Pepper) যার বৈজ্ঞানিক নাম 'পিপার নাইগ্রাম লিনিয়াস' (Piper nigram Linn.) মশলার রাজা বললে অতিশয়োক্তি হয় না। ভারতবর্ষে এর ব্যবহার বহুকাল ধরেই হয়ে আসছে। বহু যুগ ধরেই সোম, সিল্ক এবং মূল্যবান রত্নাদির মতো গোলমরিচও একটি উল্লেখযোগ্য পণ্য। ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে গোলমরিচকে কারুথা পন্নু (Karutha Ponnu) বা কালো সোনা বলে অভিহিত করা হয়।

গোলমরিচ বেরী জাতীয় শুকনো ফল। এর গাছ লতানো গুল্ম, যার কাণ্ডটি ক্রমশঃ মাধবীলতার মত কাষ্ঠল হয়ে পড়ে। পাতাগুলো ঘন সবুজ রং-এর ডিম্বাকৃতি। উষ্ণ আর্দ্র অঞ্চলে যেখানে বৃষ্টিপাত বছরে 2500 সেণ্টিমিটারের বেশি হয় এবং মাটিতে প্রচুর হিউমাস থাকে সেখানে এর ফলন সবচেয়ে বেশি হয়। গোলমরিচ কুঞ্জে গাছের তিন বছর বয়স হলেই বেরীগুলির উৎপাদন শুরু হয় এবং গাছের সাত আট বছর বয়স থেকে পূর্ণমাত্রায় ফলন শুরু হয়। পঁচিশ বছর বয়স থেকেই গাছের ফলন কমতে শুরু করে। পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত একটি গাছ বাঁচে। সবুজ বেরী জাতীয় ফলগুলিকে প্রখর সূর্যালোকে ছয় থেকে আটদিন শুকিয়ে কালো মরিচে পরিণত করা হয়।

এটা যদিও জানা কথা যে মশলাযুক্ত খাবার পুষ্টিগুণসম্পন্ন হয় না তবুও আশ্চর্য ব্যাপার এই যে গোলমরিচ-এর মধ্যে শতকরা এগার ভাগ প্রোটিন, যাদের অন্যতম হল লাইসিন, হিস্টিডিন এবং সিস্টেইন। অসংপৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড রূপে চর্বিযুক্ত খাদ্যাংশ থাকে শতকরা দশ ভাগ। শতকরা সাতান্ন ভাগ শর্করা জাতীয় খাদ্য থাকে স্টার্চ রূপে। একশ গ্রাম গোলমরিচ চারশ ক্যালরি তাপশক্তি সরবরাহ করতে পারে।

খাদ্যে গোলমরিচ ব্যবহার করা হয় এর ঝাঁঝাল স্বাদ এবং বিশিষ্ট গন্ধের জন্য। যা প্রচুর লালা নিঃসরণে সহায়তা ক'রে পাচনে সহায়তা করে। পিপারিন নামক উপক্ষার-এর উপস্থিতির জন্যই গোলমরিচ তীব্র ঝাঁঝাল ক্ষমতাযুক্ত।

আয়ুর্বেদে ক্ষুধাবর্ধক, হজমকারক ঔষধের অনুপানরূপে এবং ঔষধরূপে গোলমরিচের ব্যবহার সুবিদিত। বাত ডায়েরিয়া এবং কলেরার ঔষধ প্রস্তুতেও গোলমরিচের ব্যবহার করা হয়। পাকস্থলী এবং অন্ত্রের জারকরস নিঃসরণে গোলমরিচ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে বিভিন্ন গবেষণায় এটা প্রমাণিত হয়েছে। খাদ্য সংরক্ষক হিসেবেও গোলমরিচের ভূমিকা অগ্রগণ্য। টিনজাত খাদ্যে এর বহুল ব্যবহার প্রচলিত। স্যুপ, চাটনী, সস-এর মধ্যেও ব্যবহার করা হয়।

পেঁপের বীজ অনেক সময় গোলমরিচের মধ্যে ভেজাল দেওয়া হয়। ইথানলের মধ্যে সন্দেহযুক্ত দানাগুলো ফেললে পেঁপে বীজগুলো ভেসে উঠবে। তাছাড়া উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে গোলমরিচের স্টার্চ পরীক্ষা করে নকল বা আসল ধরা হয়।

কেরালায় প্রতি একরে দশ হাজার কেজি গোলমরিচ ছয়শ মত কুঞ্জ পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষ বৎসরে দুই থেকে আড়াই কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করে গোলমরিচ রপ্তানি করে।

1/4, বারোয়ারীতলা রোড, বেলেঘাটা, কলি-10

[আরও এক্সপেরিমেন্ট : আট]

দিন কয়েক পরে ফিরে এল জেয়াস। সঙ্গে আর একটা ওরাংওটাং। বেশবাস একই। চালচলনও এক-রকমের। দুজনেই বৈজ্ঞানিক। কোন সন্দেহ নেই।

এই কদিনে অজস্র এক্সপেরিমেন্ট হয়েছে আমাকে নিয়ে। সবই পশুদের সহজাত বুদ্ধি সংক্রান্ত। সব পরীক্ষাতেই দারুণ ফল দেখিয়েছি আমি। গরিলা ওয়ার্ডার দুজনের নামও জেনেছি—জোরাম আর জানাম। টুকরো টুকরো সহজ ভাষাও শিখেছি। বিশেষ করে জিরার কথা নকল করে অনেক জেনেছি। বুদ্ধিমত্তায় যে আমি একেবারেই আলাদা ধরনের তা ওরা বেশ বুঝেছে। জিরার গর্ব যেন তাতে বেশ বেড়েছে।

জেয়াস এসেই লম্বাচওড়া বক্তৃতা দিল সঙ্গী বৈজ্ঞানিককে—অবশ্যই আমাকে দেখিয়ে। খুবই ঝামেলা পাকিয়েছি সন্দেহ নেই। জিরার সঙ্গেও দারুণ কথা কাটাকাটি হয়ে গেল দুজনের—আমার খাঁচার সামনেই। আমার তীক্ষ্ণ মেধা যে সত্যিই বিস্ময়কর, জিরা তা বোঝাবার আপ্রাণ চেষ্টা করে গেল বটে, কিন্তু বিদ্রূপ আর অবিশ্বাসের হাসিই হেসে গেল দুই বৈজ্ঞানিক আগাগোড়া।

আবার শুরু হল আমার মেধার পরীক্ষা। কঠিন পরীক্ষা। পাশ করে গেলাম। সে কী আনন্দ জিরার! কিন্তু মুখ-পোড়া ওরাং ওটাং দুটো ভারিক্কি চালে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললে, তার সব না বুঝলেও এইটুকু বুঝলাম—অনুকরণ প্রবৃত্তি একটু বেশি মাত্রায় থাকলে আমার মত জীব এমন কিছু দুর্লভ নয়।

জিরা একমত হল না কিছুতেই। যাওয়ার আগে জেয়াস হুকুম দিয়ে গেল, খাঁচার মানুষদের পাল্টাপাল্টি করা দরকার। দুটো মানুষকে রাখা হল এক-একটা খাঁচায়।

আমার খাঁচায় রাখা হল নোভাকে—সোরোর গ্রহে নেমেই যাকে দেখেছিলাম সবার আগে।

এর পরের কয়েক সপ্তাহ ধরে আমাদের নিয়ে অনেক পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে গেছে নরবানরেরা। বিশদ বিবরণ আর দেব না। মানুষ মানুষের সঙ্গে আচরণ করে কিভাবে, এইটাই যেন দেখতে চেয়েছে এরা। বেচাল দেখলেই সবু মুখ ডাণ্ডা দিয়ে খুঁচিয়ে শায়েস্তাও করেছে। বিজ্ঞানসম্মতভাবে পর্যবেক্ষণ করা দেখে অবাক না হয়ে পারিনি। প্রতিটি অসঙ্গত আচরণ লক্ষ্য করেছে এবং নোট লিখে নিয়েছে।

খোঁচা আমাকেও খেতে হয়েছে। কিন্তু কিছুতেই ওদের হুকুমমত ওঠবোস করিনি। অনেক নিগ্রহই জুটত এই অবাধ্যতার ফলে—জিরা এসে পড়ায় আর তা হল না।

বুদ্ধিদীপ্ত চোখে বেশ কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থাকার পর এগিয়ে এসেছিল জিরা। আমার ঘাড়ের পেছনে টুক টুক করে টোকা মারতে মারতে যা বলেছিল, তার হুবহু মানে বুঝতে না পারলেও মনে হয়েছিল যেন বলতে চাইছে :

"বেচারা! একেবারে দলছাড়া! একই জাতের মানুষ তো এরাও। তোমার মত অদ্ভুত কেউ নয়। যা বলা হচ্ছে, তা করে গেলেই হয়—পুরস্কার পাবে সঙ্গে সঙ্গে।

বলে, পকেট থেকে এক ডেলা চিনি নিয়ে বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। ভীষণ হতাশ হলাম। জিরাও আমাকে পশু ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছে না? হয়ত একটু বেশি বুদ্ধিমান, তার বেশি কিছু নয়? সজোরে ঘাড় ঝাঁকিয়ে এককোণে গিয়ে বসে রইলাম গুম হয়ে। নোভা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল আমার দিকে। তারও যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে।

ঠিক এই সময়ে এল জেয়াস। দাপটটা যেন আগের

চাইতেও বেশি। এসেছে এক্সপেরিমেন্টের খবর নিতে। প্রথমেই জানতে চাইল আমার খবর। জিরা গড় গড় করে বলে গেল আমার খাপছাড়া ব্যবহারের বৃত্তান্ত। খুবই অখুশি হল জেয়াস। দুহাত পেছনে মুষ্টিবদ্ধ করে পায়চারি করল কিছুক্ষণ খাঁচার সামনে। তারপর নতুন অর্ডার দিল গরিলাদের।

নোভাকে খাঁচা থেকে টেনে বার করে এক্সপেরিমেন্টের নামে ওর ওপর অত্যাচার শুরু করতেই মাথায় রক্ত চড়ে গেছিল আমার। উন্মত্তের মত দাপাদাপি শুরু করেছিলাম। গরাদ ধরে ঝাঁকিয়েছিলাম। দাঁত বার করে চিৎকার করেছিলাম। ঠিক অন্য মানুষগুলোর মত। খুশি হয়েছিল জেয়াস, জিরা আর গরিলা দুজন। আমিও তাহলে মানুষ পশু!

নোভাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেছিল খাঁচায়।

জ্যামিতির নকশা

খাঁচার পরিবেশে খুব সহজেই মানিয়ে নিতে পেরেছিলাম নিজেকে। তোফা আরামেই ছিলাম বলা চলে। যা চেয়েছি, তাই দিয়েছে গরিলা দুজন। এইভাবেই কেটে গেল একটা মাস। নরবানরদের ভাষার নতুন কোনো শব্দ আর শেখা হয় নি। জিরার সঙ্গে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করলে হয়ত শিখতাম, কিন্তু সে চেষ্টা করিনি। জিরাও ধরে নিয়েছে, জেয়াসের কথাই ঠিক। জন্তু ছাড়া আমি কিছুই নই। একটু হয়ত বেশি বুদ্ধিমান, কিন্তু প্রতিভাবান নই।

খাঁচার অন্য মানুষরা আমাকে সমীহ করত আমার বুদ্ধিমত্তা দেখে। গরিলা দুজনও বেশ বন্ধুর মত হয়ে উঠেছিল। যাচাই করার জন্যে যত পরীক্ষাই করুক না কেন সব

হাত থেকে ছিনিয়ে নিলাম নোট বই আর ফাউন্টেন পেন

পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হতাম অনায়াসেই, উপহারও পেতাম অঢেল। ভাগাভাগি করে নিতাম নোভাদের সঙ্গে।

হপ্তাকয়েক পরে আচমকা অসহ্য লাগল এই অবস্থা। খুব সম্ভব প্রফেসর অ্যান্টেলের কথা মনে পড়ার জন্যেই যেন চৈতন্য ফিরে এল আমার। উনি বেঁচে আছেন কিনা জানি না। যদি থাকেন আর এই অবস্থায় আমাকে দেখেন—কি ভাববেন?

ঠিক করলাম, আর নয়। সুসভ্য মানুষের মতই আচরণ করব এখন থেকে।

জিরা এসেছিল খাঁচার সামনে। হাত থেকে ছিনিয়ে নিলাম নোটবই আর ফাউন্টেন পেন। খড়ের বিছানায় বসলাম। নোভার একটা স্কেচছবি আঁকলাম। পেশায় আমি ড্রাফটসম্যান, অঙ্কনবিদ্যাটা ভালই জানি। ছবি ধরিয়ে দিলাম জিরার হাতে।

চোয়াল লাল হয়ে গেল জিরার। থর থর করে কাঁপতে লাগল সারা দেহ। নির্নিমেষে চেয়ে রইল আমার দিকে। নোটবই আর ফাউন্টেন পেনের দিকে আবার হাত বাড়ালাম। বাধা দিল না জিরা। কি বোকা আমি! ধীশক্তি যে আমার আছে, সেটা জানানোর সহজ এই পন্থাটা আগে মাথায় আসে নি কেন? স্কুলে যেটুকু জ্যামিতি পড়া ছিল, তা থেকেই কিছু কিছু এঁকে দিলাম। হতভম্ব হয়ে গেল জিরা। আবার জিরা যা আঁকল জ্যামিতির ছকে তার সমাধানও করে দিলাম। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল জিরা। এবার আমি মোক্ষম ছবি আঁকলাম। বেটেলগুজ সূর্য আর তার চারপাশের গ্রহ আঁকলাম। জিরার আঙুল ঠেকিয়ে ছবির গায়ে আঙুল ঠেকালাম। অর্থাৎ জিরা থাকে এই সৌরজগতে। তারপর আঁকলাম আমাদের সূর্যের ছবি আর চারপাশের নটা গ্রহের ছবি। আমার গায়ে আঙুল ঠেকিয়ে ফের আঙুল ঠেকালাম ছবির বুকে। অর্থাৎ, আমি এসেছি ঐখান থেকে। স্তম্ভিত বিস্ময়ে আকাশের দিকে আঙুল তুলে ইঙ্গিত করল জিরা। ঘাড় হেলিয়ে সায় দিলাম আমি। হ্যাঁ, আকাশ পথেই এসেছি আমি।

ঠিক এই সময়ে জেয়াসের সঙ্গে গরিলা দুজন এসে পড়ায় ঝটপট নোটবই আর ফাউন্টেন পেন আমার হাত থেকে টেনে নিল জিরা। ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বললে চুপচাপ থাকতে।

ধী-শক্তির তুঙ্গে কারা?

এর পর থেকেই জিরার দৌলতে বানর গ্রহ এবং তাদের ভাষা সম্পর্কে আমার জ্ঞানের পরিধি ক্রমশঃ বেড়েই চলল। প্রতিদিন নানা ছুতোনাতায় আমার সঙ্গে দেখা করত জিরা। শিখত আমার ভাষা। শেখাত ওদের ভাষা। অবাক হয়েছিলাম আমার চাইতে ওর শেখাবার ক্ষমতা অনেক বেশি দেখে। দু'মাসের মধ্যেই নানান্ বিষয়ে আলোচনা চালানোর মত ভাষা রপ্ত করেছিলাম দুজনেই। একটু একটু করে জেনেছিলাম সোরোর গ্রহে কি ধরনের সভ্যতা তৈরি হচ্ছে।

কথাবার্তা রপ্ত হয়ে যেতেই প্রথম এবং মূল প্রশ্নটা করেছিলাম আমি। বাঁদররাই কি এই গ্রহের একমাত্র যুক্তিবাদী জীব? সোরোর গ্রহে সব প্রাণীদের সেরা?

জিরা বলেছিল—"তাতো বটেই। মন আর দেহ—এ দুটোই আছে কেবল বাঁদরদেরই। আমাদের বৈজ্ঞানিকরা অনেক গবেষণা করেছেন এ ব্যাপারে।"

"মানুষরা তাহলে কী?"

"সব জীবই একটা মূল উৎস থেকে এসেছে। চিন্তাশীল শিম্পাঞ্জীরা অনেক ভেবে চিন্তে এই তত্ত্বে এসেছেন।"

"মানুষ তাহলে বাঁদরের পূর্বপুরুষ?"

"অনেকে সেইরকম মনে করেন। আসলে তা নয়। একই উৎস থেকে প্রাণিজগৎ বিবর্তিত হতে হতে মানুষ আর বাঁদর দুটো শাখায় পৌঁছে যায়। মানুষের শাখাটা বেশিদূর এগোতে পারেনি। মনহীন পশুই রয়ে গেছে। এগিয়েছে বাঁদররা। মূল তিনটে প্রজাতিতে উন্নতি করেছে।"

"তারা কারা?"

"শিম্পাঞ্জী, ওরাংওটাং, গরিলা। শিম্পাঞ্জীরা সবচেয়ে প্রতিভাবান। যা কিছু ভাবনাচিন্তা উদ্ভাবন আবিষ্কার—সব শিম্পাঞ্জীরাই করেন। তাঁরা যা লিখে বই আকারে ছাপিয়েছেন ওরাংওটাং তা মুখস্থ করে সেই মত কাজ করে যায়। গরিলারা মাংস খায়। গায়ের জোর খাটায়। শক্তির জোরে একসময়ে এ গ্রহে সবার ওপরে ডাণ্ডা ঘুরিয়েছে। এখন সংগঠক আর হুকুমদার হিসেবে কাজে লেগেছে।

"জিরা, মানুষদের মগজ উন্নত হল না, বাঁদরদের হল কেন?"

"হবে কি করে? মাত্র দুটো হাত মানুষদের। সুবিধে কম, গাছে গাছে যাতায়াত করা অথবা যন্ত্রপাতি ঠিকমত কাজে লাগানো—দুহাতে সম্ভব নয়। বাঁদরদের চার হাতে তাই উন্নতি দ্রুত হয়েছে। শিখেছে তাড়াতাড়ি, মগজও বেড়েছে সেইভাবে। অবশ্য এ ব্যাপারে এখনও গবেষণা চলছে। কর্নেলিয়াসের গবেষণার বস্তু এই বিষয়টাই।"

"কর্নেলিয়াস কে?"

"আমি যাকে বিয়ে করব।"

"শিম্পাঞ্জী?"

"নিশ্চয়।"

আরও কিছু কথা জিজ্ঞেস করার ছিল, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে গরিলা দুজন নিয়ে এল রাতের খাবার। খাবার দিয়ে গলিপথের শেষের আলোটা জ্বালিয়ে দিয়ে চলে গেল বাইরে।

গুম হয়ে বসে ভাবতে লাগলাম জিরার কথাগুলো। পৃথিবীতে যে কারণে বাঁদর মানুষদের নাগাল ধরতে পারেনি—সোরোর গ্রহে দেখছি ঠিক সেই কারণে মানুষ বাঁদরদের চেয়ে পেছিয়ে গেছে।

[আগামী সংখ্যায় ঃ বাঁদরদের শহর]

মানব কুমার দাশ

V.C.R এ কি করে কোন দৃশ্যকে রেকর্ড করা হয় জানার আগে টেপরেকর্ডারের সাউণ্ডট্রাক পদ্ধতিটা জেনে নিলে বুঝতে কিছু সুবিধা হবে।

বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন তাঁর শক্তির নিত্যতা সূত্রে বলেছেন যে এই পৃথিবীতে মোট শক্তির পরিমাণ ধ্রুবক অর্থাৎ শক্তির বিন্যাস যেমন সম্ভব নয় তেমনি শক্তির সৃষ্টিও সম্ভব নয়।" কিন্তু একশক্তিকে অন্যশক্তিতে পরিবর্তিত করা যায় যেমন বিদ্যুৎ-শক্তি থেকে আলোকশক্তি হয়। এই পৃথিবীতে মোট সাত-প্রকার শক্তি আছে। তারমধ্যে তিনটি হল ঃ আলোকশক্তি, শব্দশক্তি, এবং চৌম্বকশক্তি।

প্রথমে আসা যাক ক্যাসেটের কথায়। বিজ্ঞানীরা 'ম্যাগনেটাইট' নামে একটি যৌগ আবিষ্কার করেছেন [Fe_3O_4 বা চৌম্বক অক্সাইড]। যৌগটির রাসায়নিক নাম ফেরোসফরিক অক্সাইড। একে চলতি কথায় চৌম্বক অক্সাইডও বলা হয়। কারণ এই যৌগ কোন চুম্বকের সংস্পর্শে এলে এরাও চুম্বকে পরিণত হয় এবং এদের চৌম্বকত্ব তখন আর সহজে নষ্ট হয় না অর্থাৎ চৌম্বকত্ব দীর্ঘদিন স্থায়ী থাকে। ক্যাসেটে সাধারণতঃ এই যৌগই ব্যবহার হয়। অবশ্য বর্তমানে অধিক সুন্দর আওয়াজের জন্য চৌম্বক অক্সাইডের বদলে ক্রোমিয়াম ডাই-অক্সাইডও ব্যবহার করা হয়। দুইটি স্বচ্ছ পাতলা প্লাসটিকের ফিতের মধ্যে এই যৌগ রেখে প্লাসটিকটিকে সিল করে দেওয়া হয়। এবং সেটিকে ক্যাসেটের ভিতর রোল করে রাখা হয়।

আমরা পূর্বেই বলেছি যে এক শক্তিকে অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। সেই সূত্র অনুযায়ী প্রথমে মাইক্রোফোনের সাহায্যে শব্দকে হুবহু বৈদ্যুতিক স্পন্দনে রূপান্তরিত করা হয়। তারপর এই দুর্বল বৈদ্যুতিক স্পন্দনকে অ্যামপ্লিফায়ার বা বিবর্ধকের সাহায্যে বর্ধিত করা হয় বা জোরাল বিদ্যুৎ তরঙ্গে রূপান্তরিত করা হয়। এই তরঙ্গকে একটি বিদ্যুৎ-চুম্বকের [Electro Magnet] সাহায্যে চৌম্বকশক্তিতে পরিণত করা হয়। এই চৌম্বকশক্তি যেন সরাসরিভাবে বিদ্যুৎএর উপর বা শব্দের জোরের উপর নির্ভর করে। এই সময় ক্যাসেটের ফিতেটিকে চুম্বকের উপর দিয়ে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ফলে ফিতের উপর শব্দের একটি হুবহু চৌম্বক প্রতিলিপি পড়ে যায়।

এবারে বলি কিভাবে ঐ চৌম্বকলিপি থেকে শব্দ পুনরুৎপাদন করা হয়। মাইকেল ফ্যারাডে তার একটি সূত্রে বলেছেন যে কোন চুম্বককে যদি কোন আর্মেচার বা তার কুণ্ডলীর ভিতর গতিশীল রাখা যায় তাহলে ঐ আর্মেচার একটি তড়িচ্চালক বলে আবিষ্ট হয়। এখন আমরা যদি মনে করি ফিতেটি একটি চুম্বক এবং ঐ ফিতে বিদ্যুৎ চুম্বকের উপর গতিশীল তা হলে ফ্যারাডের সূত্র অনুযায়ী ঐ চুম্বকের কয়েল একটি তড়িচ্চালক বলে আবিষ্ট হয়। (বলা বাহুল্য ঐ বিদ্যুৎ চুম্বকটি একটি অশ্বক্ষুরাকৃতি লৌহযন্ত্রের উপর জড়ানো আর্মেচার মাত্র)। এই বিদ্যুৎকে পুনরায় বিবর্ধিত করে স্পীকারে যুক্ত করলেই রেকর্ড করা শব্দ পুনরায় শোনা যাবে।

ভিডিওর কাজও প্রায়ই এই রকম তবে পার্থক্য এই যে টেপরেকর্ডারে শব্দকে রেকর্ড করা হয়। কিন্তু এখানে আলোকে রেকর্ড করা হয়। এখন এই আলোকে কিভাবে বৈদ্যুতিক স্পন্দনে রূপান্তরিত করা হয় সেও এক অতি দুরূহ ব্যাপার। সুতরাং সে প্রসঙ্গে না যাওয়াই ভালো। শুধু এইটুকু জানা প্রয়োজন যে বিশেষ পদ্ধতিতে আলোকে হুবহু বৈদ্যুতিক তরঙ্গে রূপান্তরিত করা যায় এবং এই বৈদ্যুতিক চৌম্বক শক্তিতে পরিণত করে পূর্বের ন্যায় ক্যাসেটের সাহায্যে রেকর্ড করা হয়।

কিন্তু ক্যাসেটের এই চৌম্বকলিপি থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎ তরঙ্গকে পুনরায় দৃশ্যে পরিণত করাও একটু জটিল ব্যাপার। তার আগে ক্যাথোড টিউব সম্বন্ধে বলে নি।

ক্যাথোড টিউব হল এমন কিছু মৌল যাদের উত্তপ্ত করলে তা থেকে প্রচুর ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে যেমন টাংস্টেন। আবার টাংস্টেনএর রোধ খুব বেশী বলে এতে স্বল্পবিভব প্রয়োগ করলেই সহজে উত্তপ্ত হয়ে পড়ে এবং এর থেকে প্রচুর ইলেকট্রন নির্গত হয়। বর্তমান ক্যাথোড টিউব এই নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত। একটি তার টাকে বদ্ধ কাঁচনলের ভিতর একদিকে একটি টাংস্টেন তার লাগানো থাকে এবং অপরমুখে একটি ইলেকট্রোড থাকে। ঐ টাংস্টেন তারটাক বিভব প্রয়োগ করে উত্তপ্ত করলেই তা থেকে প্রচুর ইলেকট্রন নির্গত হয়। তখন অপর ইলেকট্রডকে খুব উচ্চ ধণাত্মক বিভবপ্রভেদে আহিত করা হয়। ফলে ঐ ইলেকট্রন গুলি তড়িৎক্ষেত্রের মধ্যে থেকে একসঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে যায় এবং একটি বিন্দুর আকার প্রাপ্ত হয়ে কাঁচের গায়ে আঘাত করে। কাঁচের গায়ে ফ্লোরিসেণ্টোল গুঁড়ো লাগানো থাকে। তখন এই ইলেকট্রনগুলি বিন্তু বিন্দু আলোকপ্রভবের রূপ পায়। বিভবের ভিতর উল্লম্বভাবে এবং অনুভূমিকভাবে দুই জোড়া পাত থাকে। এই পাতগুলিকে পর্যায়ক্রমিকভাবে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধানে আহিত করা হয়। ফলে ইলেকট্রন রশ্মি তড়িৎক্ষেত্রের প্রভাবে বিভিন্ন কোনে বেঁকে যায়। এই-ভাবে স্ক্রীনে বিন্দু বিন্দু আকারে পুরো ছবি গড়ে উঠে।

মানকুণ্ডু গড়েরধার, চন্দননগর, হুগলী

প্রফেসর বুদ্ধিধর স্বল্পপরিচিত হলেও বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁর যথেষ্ট সুনাম আছে। নানারকম উদ্ভাবন তাঁর মজ্জাগত। এজন্য কেউ তাঁকে খেয়ালী বলেন না যে তা নয়, কিন্তু খেয়ালী থেকেই যে পৃথিবীতে অনেক কিছু সৃষ্টি হয়েছে এ কথা মানতেই এবে।

একবার মনে আছে প্রচুর মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর ভিড় হয়েছিল ওঁর বাড়িতে যখন তিনি ফসিলরূপা পাথরকে কাঠে রূপান্তরিত করেছিলেন। একজন ত দেওঘরের গোটা ত্রিকূট পাহাড়টা কিনে নেবার চেষ্টা করেছিল। কেননা ঐ পরিমাণ প্রস্তর কাষ্ঠরূপ পেলে বহুমূল্য হয়ে প্রচুর লাভ এনে দেবে।

যাই হোক। প্রফেসারের অনেক কাহিনীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে। তাঁর এক প্রিয়বন্ধু কথাময় ওরফে আমি। আমার পেশা কথা নিয়ে তাই হয়ত ঐ নাম। ক্লাশে টিচার কিম্বা প্রফেসার লেকচার দিয়ে মাত করে দেন—তা শোনে ছেলেমেয়েরা। আর একটি কথার ক্ষেত্র হল সভাস্থল যেখানে নেতা ও রাজনৈতিক কর্তারা বক্তৃতা দেন। আমি ওঁদকে না গিয়ে কথাগুলো কাগজে বসাই এবং তা থেকে বই ছাপা হয়।

একদিন আমি গিয়েছি প্রফেসারের বাড়িতে। কফি পাত্র সবেমাত্র শেষ করেছি উনি বললেন, আপনি ত বই লেখেন তাতে বেশ পরিশ্রম আছে তাই নয়? পরিশ্রম আর কিসে নেই বলুন স্যার। বলি আমি।

আচ্ছা বলুন ত পৃথিবীতে দুজাতের লোক সবচেয়ে বেশি, তারা কারা?

মনে হল কোনো এক বিরাট পরীক্ষা দিতে বসেছি। বললাম, সব লোককে ভাগ করলে ত অনেক রকমে ভাগকরা যায়—কোনদিক দিয়ে করব ঠিক বুঝতে পারছি না।

আহা। এতো সোজা কথা—স্যার বলে উঠলেন, ধরুন পৃথিবীর লোকের এক বৃহৎ অংশ কাজ করতে চায় না। কিছু না করে পকেট ভর্তি করতে চায়—কি? ঠিক নয়?

রাইট! ঠিক বলেছেন। আর এক ভাগ শুধু ভোজন প্রিয়, খাওয়া ছাড়া তারা অন্য কিছু চায় না।

ঠিকই বলেছেন। আমি তাঁর কথায় সায় না দিয়ে পারি না।

এমন সময় ওঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্রোঞ্চি বলল, আপনাদের আর একটু কফি লাগবে ? দশরথ আজ মকোড়া বানাচ্ছে।

মকোড়া ? সেটা কি পদার্থ ? স্যার চমকিত।

পকোড়া জাতীয়, মকাই দিয়ে বলে নাম মকোড়া।

ও মাই গড্ ! স্টপ প্লিজ ! ওর খেয়াল মত যা খুশি খাওয়াতে চায়—না, বলে দাও শুধু কফি আর একটা ক্রীম-ক্র্যাকার, বাস – আর শোনো. ঐ সলিউশানটা distil করতে দিয়েছি। তাপটা একটু কমিয়ে দাও। হ্যাঁ, আরো একটা কথা, আমার টেলিপ্যাথি ইকুইপমেন্টটা ঐখানে রেখে দাও —আমি একটু পরেই যাচ্ছি।

ব্রোঞ্চি আদর্শ সেবকের মত চলে গেল।

আমার মনে নানা প্রশ্ন উঁকি মারছে কিন্তু কি জিজ্ঞেস করব। ঐ সব কূট তত্ত্বের কতটুকুই বা বুঝি।

প্রফেসার একখানা ক্রীমক্র্যাকার চিবুতে চিবুতে কফি সহযোগে তাকে গলা থেকে নামিয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করে বললেন, আচ্ছা বলুন ত পৃথিবীতে কোন লেখক সবচেয়ে বেশি বই লিখেছেন, হাতে বা টাইপ করে যেভাবেই হোক ?

আমার মনে হয়, আমাদের রবীন্দ্রনাথই প্রথম হবেন। এর আগে আমরা ভাবতুম H. G Wells বা Tolstoy এর কথা।

ওহ্। শক্তির কি বিরাট অপচয় ভাবুন ত। রবীন্দ্রনাথকে সবই হাতে লিখতে হয়েছে। ইংরেজি লেখকরা টাইপ করেছেন। টাইপ থেকে compose তারপর ছাপা। তার পর বই বাঁধানো ইত্যাদি। যাক, আপনাকে আর দেরী করাব না, আপনার মাথায় একটা ছোট plot এসেছে বুঝতে পাচ্ছি। তাই না ?

কি করে বুঝলেন ?

এগুলো mind reading। কেউ বলে telepathy। আপনি কাল হয়ত একটা নতুন কিছু পাবেন। আচ্ছা good night—বলেই স্যার তার ল্যাবের দিকে চললেন। আমিও বাড়িমুখো হলাম।

পরদিন কেটে গেল। সন্ধ্যাবেলা মনে পড়ল স্যারের কথা। কই, কিছু ত পাঠালেন না। হয়ত তৈরি হয়নি কিম্বা ভুলে গেছেন।

রাত এগারোটা। নিস্তব্ধ রাত বলতে পারি না। দূরে ও কাছে মাঝে মাঝে কুকুরের কেঁউ কেঁউ শব্দ কানে আসছে আর মাঝে মাঝে গাড়ির হর্ন। খাওয়া শেষ করে শোবার আয়োজন করছি এমন সময় বাইরের দরজায় ঠক ঠক শব্দ। আমি ও আমার স্ত্রী দুজনেই এগিয়ে এসেছি দরজার কাছে। দরজা খুলতেই দেখি এক অদ্ভুত দর্শন লোক দাঁড়িয়ে। আপাদমস্তক ঢাকা এক ধূসর জোব্বা জাতীয় পোশাক, মুখে কোনো বাক্য নেই।

কাকে চাই ? চেঁচিয়েই বলে উঠলাম।

উত্তর নেই। একটি হাতে একটি মোড়ক ধরে এগিয়ে দিল আমার দিকে।

কি আছে এতে ? আবার আমার প্রশ্ন।

একটা উত্তর না দিয়েই মূর্তি আপনা হতে অপসৃত হল।

মোড়ক খুললাম আলোর কাছে এসে। দেখি স্যারের একটা চিঠি লেপ্টে আছে মোড়কে। পড়লাম সেটি – প্রিয় কথাময় বাবু, একটু দেরী হল পাঠাতে। এর মধ্যে পাবে ছোট্ট পলিথিনের ব্যাগে একটি ছোট্ট প্লাস্টিকের শিশি। মুখে ড্রপার লাগানো আছে। ঐ দিয়ে মাত্র এক ফোঁটা জিভের উপর দিয়ে চোখ বুজে বসে থাকবে। ভয়ের কিছু নেই। শুধু আস্বাদ অনুভব করবে। মনে কোনো উত্তেজনা বা চিন্তা ভাবনা না থাকলে ভাল হয়। কি রকম লাগে পরে জানাবে।

ইতি, প্রফেসর বিড।

খানিকটা বুঝলাম কিন্তু সবটা নয়। কি করব ? রাত্রেই চিঠির নির্দেশমত কাজ করব, না পরদিন ? কে এসেছিল ? লোকটি কে ? চেনা বলে ত মনে হয় না। স্ত্রী সুলতা সব শুনে বলল—রেখে দাও, কাল যা হয় কোরো। মনে মনে ভাবছি দিনের বেলা নানা কাজ আর হাজার চিন্তা—

ঘরের মধ্যে আর একবার আলোয় প্যাকেট খুলে দেখলাম-ঠিক একটি ছোট্ট শিশি Eye-drop এর মত। ফোঁটা ফেলারও ঐ রকম ব্যবস্থা। শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুম আসে না যে। একি বিপদ। যদি বা এল ভোর রাত্তিরে ঘুম ভেঙ্গে গেল। সবাই তখন ঘুমুচ্ছে। আস্তে করে উঠলাম। এঘর ওঘর করলাম। তারপর মুখ ধুয়ে প্রস্তুত হয়ে শিশিটি হাতে নিয়ে বসলাম বাগানের দিকে একটা আধভাঙা আরাম কেদারায়।

মনটা তখন বেশ শান্ত, পূর্বদিক সামান্য ফরসা হচ্ছে। মাঝে মাঝে কি একটা পাখি ডেকে উঠছে। প্রফেসারের নির্দেশ পালনের পক্ষে উপযুক্ত সময় বলতেই হবে। ড্রপার থেকে এক ফোঁটা লিকুয়িড সাবধানে জিভের উপরে দিতে কেমন যেন চিন চিন করে উঠল। তারপর একটা তীব্র স্বাদ এবং সেই সঙ্গে চিন্তাটা জট পাকিয়ে উঠল এবং একটা আবর্তের সৃষ্টি করল। তারপর নানা দৃশ্য রঙিন প্যানোরামার মত ঘুর পাক খেতে লাগল। বাহ ! বেড়ে মজা ত – কিন্তু পরমুহূর্তেই সব যেন মিলিয়ে যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছি প্রশস্ত প্রান্তর। মাঝে মাঝে ঘন বন-ঝাউয়ের ঝোপ। দূরে পাহাড়, আকাশটা বেশ ঘন নীল। কোন দেশ হতে পারে এটা ? এ প্রশ্ন কিন্তু মনে জাগছে না।

কিন্তু ও কে ? একজন কুৎসিৎ দর্শন লোক প্রাণপণে ছুটে যাচ্ছে। কোলে তার রোরুদ্যমান একটি মেয়ে, কত আর চার পাঁচ বছর বয়স হবে। আবার তারই পেছনে চিৎকার করে মেয়েকে ডাকতে ডাকতে ছুটে চলেছে একটি মহিলা।

ভাবছি, আমি কি দর্শকই থেকে যাব না মেয়েটিকে উদ্ধারের চেষ্টা করব ? আগেই বলছিলাম এটা আমাদের

কোলে রোরুদ্যমান একটি মেয়ে.....

দেশ হয়ত নয়। তাহলে, কিডন্যাপিং কেস ছাড়া আর কি হতে পারে এটা ?

আমি সেই ঝোপের আড়াল থেকে একটি বেশ বড় সড় পাথর কুড়িয়ে ছুঁড়লাম। অব্যর্থ টিপ। লোকটার পায়ে লাগল এবং সে পড়ে গেল। মেয়েটা ছিটকে গেল। তারপর সে উঠে একেবারে তার মায়ের কোলে। আমিই তুলে দিলাম তাকে। যাক, উদ্ধার করেছি। মায়ের আদর শুনতে পাচ্ছি—সে কি আদর! রুমা, আমার সোনার রুমা, তাকে আমি ছাড়ব না—আমার চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু পড়তে যাচ্ছে, এমন সময় দেখি লোকটা উঠে পড়েছে। ভাবছি, ও যদি আমায় আক্রমণ করে, সঙ্গে অস্ত্রও থাকতে পারে। তখন কি করব ? পালাব, না লড়াই করব ?

হঠাৎ রুমা বলে উঠল, মামি, বাবার পায়ে চোট লেগেছে। দেখছ রক্ত পড়ছে—

অ্যাঁ। বাবা! একি রহস্যময় ঘটনা! কি করলাম আমি ? কিন্তু এর মধ্যে দৃশ্যটা ঝাপসা হয়ে এসেছে। সকালের রোদ আমার গায়ে সোনা বুলিয়ে দিয়েছে—মিষ্টি হাওয়া মুখে যেন চামর বোলাচ্ছে। ছোট মেয়ে মো পিঠে হাত দিয়ে ডাকছে—বাপি, চা খাবে না ? চলো, আমরা—তোমার জন্যে কতক্ষণ বসে আছি।

সেদিনই সন্ধ্যায় স্যারকে বলতে, উনি বললেন, ওর পরের ফোঁটায় কিন্তু এর পরের দৃশ্য দেখতেও পেতে পারেন।

কি করে এটা সম্ভব হল স্যার, আমি বালকের মত উদগ্রীব কণ্ঠে প্রশ্ন করে ফেলি।

স্যার বললেন, সেটা প্রকাশ করা চলবে না—ওটা হল ট্রেড সিক্রেট। তুমি এটা নিয়ে গল্প লিখতে পার। একটা ছোট গল্প বা উপন্যাস যা খুশী। তোমাদের গল্পটাকে আমি শুধু কনসেন্‌ট্রেট করে অন্য রূপ দিয়েছি। লোকে L. S. D. খেয়ে শূন্যমার্গে পাখির মত ভেসে বেড়াবার স্বপ্ন দেখে কি কয়ে ? এটা অবশ্য তার চেয়ে উন্নত সংস্করণ, এটুকু বলতে পারি। খুব অবাক হয়েছ, তাই না—হে-হে-হে দিস্ ইজ সায়েন্‌স্!

স্যার এমন এক বিকট অট্টহাসি তুললেন যে রোগিণ ছুটে আসতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ল। দশরথ পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারতে গিয়ে পর্দাটা ছিঁড়ল। আর স্যারের ঠোঁট থেকে চুরুটটা ত অনেক আগেই পড়ে গিয়েছে।

আমি সেটা কুড়িয়ে ওঁকে দিয়ে বললাম, এটা নিভে গেছে কিন্তু স্যার।

আগুন ত নিভবেই, গল্প শেষ হয়েছে যে—বলে উঠলেন তিনি।

---

43. বালিগঞ্জ টেরাস
কলকাতা-29

এমন সময় ওঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্রোণ্ড বলল, আপনাদের আর একটু কফি লাগবে ? দশরথ আজ মকোড়া বানাচ্ছে।

মকোড়া ? সেটা কি পদার্থ ? স্যার চমকিত।

পকোড়া জাতীয়, মকাই দিয়ে বলে নাম মকোড়া।

ও মাই গড্ ! স্টপ প্লিজ ! ওর খেয়াল মত যা খুশি খাওয়াতে চায়—না, বলে দাও শুধু কফি আর একটা ক্রীম-ক্র্যাকার, বাস – আর শোনো. ঐ সলিউশানটা distil করতে দিয়েছি। তাপটা একটু কমিয়ে দাও। হ্যাঁ, আরো একটা কথা, আমার টেলিপ্যাথি ইকুইপমেণ্টটা ঐখানে রেখে দাও —আমি একটু পরেই যাচ্ছি।

ব্রোণ্ড আদর্শ সেবকের মত চলে গেল।

আমার মনে নানা প্রশ্ন উঁকি মারছে কিন্তু কি জিজ্ঞেস করব। ঐ সব কূট তত্ত্বের কতটুকুই বা বুঝি।

প্রফেসার একখানা ক্রীমক্র্যাকার চিবুতে চিবুতে কফি সহযোগে তাকে গলা থেকে নামিয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করে বললেন, আচ্ছা বলুন ত পৃথিবীতে কোন লেখক সবচেয়ে বেশি বই লিখেছেন, হাতে বা টাইপ করে যেভাবেই হোক ?

আমার মনে হয়, আমাদের রবীন্দ্রনাথই প্রথম হবেন। এর আগে আমরা ভাবতুম H. G Wells বা Tolstoy এর কথা।

ওহ্। শক্তির কি বিরাট অপচয় ভাবুন ত। রবীন্দ্রনাথকে সবই হাতে লিখতে হয়েছে। ইংরেজি লেখকরা টাইপ করেছেন। টাইপ থেকে compose তারপর ছাপা। তার পর বই বাঁধানো ইত্যাদি। যাক, আপনাকে আর দেরী করাব না, আপনার মাথায় একটা ছোট plot এসেছে বুঝতে পাচ্ছি। তাই না ?

কি করে বুঝলেন ?

এগুলো mind reading। কেউ বলে telepathy। আপনি কাল হয়ত একটা নতুন কিছু পাবেন। আচ্ছা good night—বলেই স্যার তার ল্যাবের দিকে চললেন। আমিও বাড়িমুখো হলাম।

পরদিন কেটে গেল। সন্ধ্যাবেলা মনে পড়ল স্যারের কথা। কই, কিছু ত পাঠালেন না। হয়ত তৈরি হয়নি কিম্বা ভুলে গেছেন।

রাত এগারোটা। নিস্তব্ধ রাত বলতে পারি না। দূরে ও কাছে মাঝে মাঝে কুকুরের কেঁউ কেঁউ শব্দ কানে আসছে আর মাঝে মাঝে গাড়ির হর্ন। খাওয়া শেষ করে শোবার আয়োজন করছি এমন সময় বাইরের দরজায় ঠক ঠক শব্দ। আমি ও আমার স্ত্রী দুজনেই এগিয়ে এসেছি দরজার কাছে। দরজা খুলতেই দেখি এক অদ্ভুত দর্শন লোক দাঁড়িয়ে। আপাদমস্তক ঢাকা এক ধূসর জোব্বা জাতীয় পোশাক, মুখে কোনো বাক্য নেই।

কাকে চাই ? চেঁচিয়েই বলে উঠলাম।

উত্তর নেই। একটি হাতে একটি মোড়ক ধরে এগিয়ে দিল আমার দিকে।

কি আছে এতে ? আবার আমার প্রশ্ন।

একটা উত্তর না দিয়েই মূর্তি আপনা হতে অপসৃত হল।

মোড়ক খুললাম আলোর কাছে এসে। দেখি স্যারের একটা চিঠি লেপ্টে আছে মোড়কে। পড়লাম সেটি – প্রিয় কথাময় বাবু, একটু দেরী হল পাঠাতে। এর মধ্যে পাবে ছোট্ট পলিথিনের ব্যাগে একটি ছোট্ট প্লাস্টিকের শিশি। মুখে ড্রপার লাগানো আছে। ঐ দিয়ে মাত্র এক ফোঁটা জিভের উপর দিয়ে চোখ বুজে বসে থাকবে। ভয়ের কিছু নেই। শুধু আস্বাদ অনুভব করবে। মনে কোনো উত্তেজনা বা চিন্তা ভাবনা না থাকলে ভাল হয়। কি রকম লাগে পরে জানাবে।

ইতি, প্রফেসর বিড।

খানিকটা বুঝলাম কিন্তু সবটা নয়। কি করব ? রাত্রেই চিঠির নির্দেশমত কাজ করব, না পরদিন ? কে এসেছিল ? লোকটি কে ? চেনা বলে ত মনে হয় না। স্ত্রী সুলতা সব শুনে বলল—রেখে দাও, কাল যা হয় কোরো। মনে মনে ভাবছি দিনের বেলা নানা কাজ আর হাজার চিন্তা—

ঘরের মধ্যে আর একবার আলোয় প্যাকেট খুলে দেখলাম-ঠিক একটি ছোট্ট শিশি Eye-drop এর মত। ফোঁটা ফেলারও ঐ রকম ব্যবস্থা। শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুম আসে না যে। একি বিপদ। যদি বা এল ভোর রাত্তিরে ঘুম ভেঙ্গে গেল। সবাই তখন ঘুমুচ্ছে। আস্তে করে উঠলাম। এঘর ওঘর করলাম। তারপর মুখ ধুয়ে প্রস্তুত হয়ে শিশিটি হাতে নিয়ে বসলাম বাগানের দিকে একটা আধভাঙা আরাম কেদারায়।

মনটা তখন বেশ শান্ত, পূর্বদিক সামান্য ফরসা হচ্ছে। মাঝে মাঝে কি একটা পাখি ডেকে উঠছে। প্রফেসারের নির্দেশ পালনের পক্ষে উপযুক্ত সময় বলতেই হবে। ড্রপার থেকে এক ফোঁটা লিকুয়িড সাবধানে জিভের উপরে দিতে কেমন যেন চিন চিন করে উঠল। তারপর একটা তীব্র স্বাদ এবং সেই সঙ্গে চিন্তাটা জট পাকিয়ে উঠল এবং একটা আবর্তের সৃষ্টি করল। তারপর নানা দৃশ্য রঙিন প্যানোরামার মত ঘুর পাক খেতে লাগল। বাহ ! বেড়ে মজা ত – কিন্তু পরমুহূর্তেই সব যেন মিলিয়ে যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছি প্রশস্ত প্রান্তর। মাঝে মাঝে ঘন বন-ঝাউয়ের ঝোপ। দূরে পাহাড়, আকাশটা বেশ ঘন নীল। কোন দেশ হতে পারে এটা ? এ প্রশ্ন কিন্তু মনে জাগছে না।

কিন্তু ও কে ? একজন কুৎসিৎ দর্শন লোক প্রাণপণে ছুটে যাচ্ছে। কোলে তার রোরুদ্যমান একটি মেয়ে, কত আর চার পাঁচ বছর বয়স হবে। আবার তারই পেছনে চিৎকার করে মেয়েকে ডাকতে ডাকতে ছুটে চলেছে একটি মহিলা।

ভাবছি, আমি কি দর্শকই থেকে যাব না মেয়েটিকে উদ্ধারের চেষ্টা করব ? আগেই বলছিলাম এটা আমাদের

কোলে রোরুদ্যমান একটি মেয়ে……

দেশ হয়ত নয়। তাহলে, কিডন্যাপিং কেস ছাড়া আর কি হতে পারে এটা ?

আমি সেই ঝোপের আড়াল থেকে একটি বেশ বড় সড় পাথর কুড়িয়ে ছুঁড়লাম। অব্যর্থ টিপ। লোকটার পায়ে লাগল এবং সে পড়ে গেল। মেয়েটা ছিটকে গেল। তারপর সে উঠে একেবারে তার মায়ের কোলে। আমিই তুলে দিলাম তাকে। যাক, উদ্ধার করেছি। মায়ের আদর শুনতে পাচ্ছি—সে কি আদর! রুমা, আমার সোনার রুমা, তাকে আমি ছাড়ব না—আমার চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু পড়তে যাচ্ছে, এমন সময় দেখি লোকটা উঠে পড়েছে। ভাবছি, ও যদি আমায় আক্রমণ করে, সঙ্গে অস্ত্রও থাকতে পারে। তখন কি করব ? পালাব, না লড়াই করব ?

হঠাৎ রুমা বলে উঠল, মামি, বাবার পায়ে চোট লেগেছে। দেখছ রক্ত পড়ছে—

অ্যাঁ। বাবা! একি রহস্যময় ঘটনা! কি করলাম আমি ? কিন্তু এর মধ্যে দৃশ্যটা ঝাপসা হয়ে এসেছে। সকালের রোদ আমার গায়ে সোনা বুলিয়ে দিয়েছে—মিষ্টি হাওয়া মুখে যেন চামর বোলাচ্ছে। ছোট মেয়ে মো পিঠে হাত দিয়ে ডাকছে—বাপি, চা খাবে না ? চলো, আমরা—তোমার জন্যে কতক্ষণ বসে আছি।

সেদিনই সন্ধ্যায় স্যারকে বলতে, উনি বললেন, ওর পরের ফোঁটায় কিন্তু এর পরের দৃশ্য দেখতেও পেতে পারেন।

কি করে এটা সম্ভব হল স্যার, আমি বালকের মত উদগ্রীব কণ্ঠে প্রশ্ন করে ফেলি।

স্যার বললেন, সেটা প্রকাশ করা চলবে না—ওটা হল ট্রেড সিক্রেট। তুমি এটা নিয়ে গল্প লিখতে পার। একটা ছোট গল্প বা উপন্যাস যা খুশী। তোমাদের গল্পটাকে আমি শুধু কনসেন্‌ট্রেট করে অন্য রূপ দিয়েছি। লোকে L. S. D. খেয়ে শূন্যমার্গে পাখির মত ভেসে বেড়াবার স্বপ্ন দেখে কি করে ? এটা অবশ্য তার চেয়ে উন্নত সংস্করণ, এটুকু বলতে পারি। খুব অবাক হয়েছ, তাই না—হে-হে-হে দিস্ ইজ সায়েন্‌স্!

স্যার এমন এক বিকট অট্টহাসি তুললেন যে রোণ্ডি ছুটে আসতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ল। দশরথ পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারতে গিয়ে পর্দাটা ছিঁড়ল। আর স্যারের ঠোঁট থেকে চুরুটটা ত অনেক আগেই পড়ে গিয়েছে।

আমি সেটা কুড়িয়ে ওঁকে দিয়ে বললাম, এটা নিভে গেছে কিন্তু স্যার।

আগুন ত নিভবেই, গল্প শেষ হয়েছে যে—বলে উঠলেন তিনি।

---

43. বালিগঞ্জ টেরাস
কলকাতা-29

বিজ্ঞান অনুষ্ঠান

বিজ্ঞান অন্বেষা (গুসকরা) ও AISTA (W B) এর যৌথ উদ্যোগে 17ই জানুয়ারী শনিবার গুসকরা পি.পি. ইন্সটিটিউশনের সুরেশনন্দিনী হলে একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন গুসকরা পি. পি. ইন্সটিটিউশনের প্রধান শিক্ষক গোপীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। স্থানীয় মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা এবং মহা বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের পরিচালিত ও সক্রিয় সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। বিভিন্ন বিষয়ে প্রথম স্থানাধিকারীদের নাম ঃ

বৈজ্ঞানিকদের জীবনী আলোচনা (পঞ্চম+ষষ্ঠ)—মুনমুন ঠাকুর গুসকরা বালিকা বিদ্যালয়। কুইজ (সপ্তম+অষ্টম)—তরুন-তপন-গরাই ও শুভ্রাংশু রায় (গুসকরা পি. পি. ইন্স)

তাৎক্ষণিক বক্তৃতা (নবম+দশম)—চম্পা ঘোষ (ছাটকীর্তিনগর বালিকা বিদ্যালয়) বিজ্ঞান আলোচনা (একাদশ+দ্বাদশ)—সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় (কাশেমনগর এন এ জে হাইস্কুল)

জগদীশচন্দ্র স্মারক পুরস্কার

ওয়েস্ট বেঙ্গল সায়েন্স সোসাইটি, (কালাকাটা) 'আচার্য জগদীশ চন্দ্র স্মারক' পুরস্কার নামে একটি পুরস্কার দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ছোটদের মধ্যে বৎসরের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান প্রবন্ধ রচয়িতাকে এই পুরস্কার দেওয়া হবে। 1986 সালের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান প্রবন্ধ রচয়িতা নির্বাচিত হয়েছে শিলিগুড়ির মাটিগারা সেণ্ট যোশেফ হাই স্কুলের এগারো বৎসরের মেয়ে রিনি গাঙ্গুলী।

নিখিলবঙ্গ বিজ্ঞান শিবির

দি সায়েন্স এ্যাসোসিয়েসন অব বেঙ্গলের উদ্যোগে নিখিলবঙ্গ বিজ্ঞান শিবির অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আগামী 19—21 ফেব্রুয়ারি। তিন দিন ব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে বিজ্ঞান প্রদর্শনী এবং বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান লেখকের প্রতি সম্মান না। এবারে সম্মান জানানো হবে 'বাংলার পাখির' লেখক পক্ষিবিজ্ঞানী শ্রীঅজয় হোম ও অধ্যাপক মৃণাল কুমার দাসগুপ্তকে। আলিপুর চিড়িয়াখানার উল্টোদিকে অনুষ্ঠিতব্য এই বিজ্ঞান শিবিরের সভাপতির আসন অলংকৃত করবেন মাননীয় পরিবেশ মন্ত্রী শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়।

বিজ্ঞান জনপ্রিয় করণ ঃ আলোচনা চক্র

সম্প্রতি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে পরিষদের সত্যেন্দ্র ভবনে দুদিন ব্যাপী বিজ্ঞান আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হল। আলোচনার মূল বিষয় ছিল ঃ উন্নয়নশীল দেশে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ। বাংলা দেশ থেকে আগত আব্দুল হক খন্দকার, ড. শাহ্‌জাহান তপন, মহীউদ্দীন ইসলাম, তপন চক্রবর্তী প্রমুখ বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখকগণ আলোচনা চক্রে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল—মডেল ও জ্ঞান বিজ্ঞানের বই ও পত্র পত্রিকার প্রদর্শনী। অসীমা চট্টোপাধ্যায়, জয়ন্ত বসু, রমেন পোদ্দার, সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র, অপরাজিত বসু, প্রমুখ বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান লেখকগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন এ. পি. মিত্র। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজ্যের ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী শ্রীবিনয় চৌধুরী

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকার দপ্তরে

বাংলা দেশের বিজ্ঞান লেখক লেখিকাগণের সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে দুদিন ব্যাপী আলোচনা চক্রে যোগদান করতে এসে কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের দপ্তরে এক সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন বাংলা দেশের কয়েক জন বিশিষ্ট লেখক লেখিকা। এই সাক্ষাৎকারে বাংলায় বিজ্ঞান চর্চা বিশেষতঃ ছোটদের জন্যে বিজ্ঞান গ্রন্থ রচনার কয়েকটি দিক নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়। বাংলদেশে প্রকাশিত কয়েকটি বিজ্ঞান গ্রন্থ তাঁরা সম্পাদক ও প্রধান সম্পাদককে উপহার স্বরূপ অর্পন করেন। আবদুল হক খন্দকার, তপন চক্রবর্তী, শাহ্‌জাহান তপন, সেলিনা শাহজাহান ও মহীউদ্দিন ইসলাম প্রমুখ বিজ্ঞান লেখকগন আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা

অতসি সেন

কথাটা শুনতে আশ্চর্য মনে হলেও, সত্যি সত্যিই আজ আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে জীবজগতের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই নিজেদের সীমিত জ্ঞানের পরিধিটিকে বাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছি। মহামতি সলোমনের নির্দেশ ছিল 'পিঁপড়েদের কাছে শেখ'! আমাদের সেই শিক্ষানবিশীর পালা আজও সাঙ্গ হয় নি! আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে, মনীষী দ্য ভিঞ্চিই প্রথম এ পথে পা বাড়ান, তাঁর 'অর্নিথোপ্টোপ' যন্ত্রটির পরিকল্পনা করেন পাখিদের ওড়ার কৌশল অনুকরণে। সেই থেকে সুরু করে, আজকের এই রকেট যুগের বিজ্ঞানীরা অবধি, অনেকেই পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সর্বজীবের জীবন-যাত্রাই পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন, মানবজাতির কল্যাণকল্পে সেগুলিকে প্রয়োগ করা সম্ভব কিনা।

জীবজগতের অনেকেরই ইন্দ্রিয়ানুভূতি আমাদের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত। বাদুড়ের শ্রবণশক্তি শক্তিশালী 'রাডার' যন্ত্রের চেয়েও লক্ষ গুণ কর্মনিপুণ। অবস্থানটুকুই শুধু নয়, প্রতিধ্বনিটির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতেও তারা সমধিক পারদর্শী। শিকার না সাথী, সেটি তারা প্রতিধ্বনি মাধ্যমেই বুঝতে পারে। এমন কি অন্যান্য দুহাজার গুণ জোরালো প্রতিধ্বনির মধ্যে থেকেও সামান্য একটি মশার প্রতিধ্বনি তার কান এড়ায় না। তাদের এই 'অর্জুনের লক্ষ্যভেদ'-এর মূলমন্ত্রটি আমাদের 'বেতার দূরবীক্ষণে' প্রযুক্ত করতে সক্ষম হলে আমরাও মহাকাশের নানান অপ্রয়োজনীয় শব্দলহরীর মাঝ থেকে প্রয়োজনীয় শব্দটুকু ছেঁকে নিতে পারতাম। ডলফিনদের শ্রবণযন্ত্রগুলি আবার আমাদের 'সোনার'-এর চেয়ে পাঁচ কোটি গুণ শক্তিশালী। এক মাইল দূরবর্তী অদৃশ্য মাছেদের খবরাখবরও তারা এর সাহায্যে জানতে পারে। 'সোনার'-এর প্রতিধ্বনি শুনে আজও আমরা তিমিকে ডুবোজাহাজ বলে ভুল করি। ডলফিনদের এ ভুল কিন্তু কখনই হয় না! ওদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্রগুলি আমাদের বিরাট বিরাট যন্ত্রাদির চেয়ে কত বেশী শক্তিধর সে কথা ভাবলে অবাক হতে হয়। কি করে ডলফিনরা তাদের 'সোনার' রশ্মিগুলিকে কেন্দ্রীভূত করে, কি করে বাদুড়েরা 'জ্যামিং'-এর বাধা অপসারিত করে, তার কিছুই আজ পর্যন্ত আমরা জানতে পারি নি। বাদুড় আর ডলফিনদের অনুকরণে দৃষ্টিহীনদের জন্যে যে 'দর্শন' যন্ত্রটি আমরা সৃষ্টি করেছি, আকারে আর ওজনে তা এতই বিরাট যে ওরা সেগুলি দেখলে হয়ত হেসেই আকুল হবে। 'গাল' নামক সমুদ্রচারী পাখি, জেলীফিস আর ডলফিনরা সমুদ্রের ঢেউ-এর আওয়াজ থেকেই ঝড়ের প্রতিধ্বনি উপলব্ধি করে। রাশিয়ানরা তাদের অনুকরণে এমন এক যন্ত্র তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে যার সাহায্যে বারো থেকে পনেরো ঘণ্টা আগেই ঝড়ের পূর্বাভাসটি জানা যায়।

ক্যামেরার মূলগঠনটি, তার লেন্স, ফোকস্ করার গীয়ার আর সংবেদনশীল পট নিয়ে একটি আদর্শ চোখেরই অনুরূপ। ক্যামেরাটিকে ফোকস্ করতে গেলেই লেন্সটিকে আগে পিছে করতে হয়, কিন্তু পাখি আর সরীসৃপেরা পেশীর মাধ্যমেই তাদের চোখের তারার বক্রতাটিকে কম বেশি করে (প্রতি-সরাঙ্কের [refractive index] পরিবর্তন ঘটিয়ে) খুব সহজেই ছবিটিকে ফোকসে আনে। ব্যাঙেরা দেখতে ছোট খাটো হলে হবে কি, তাদের চোখের তারাগুলি কিন্তু বিরাট। এমনই অদ্ভুত যে শুধুমাত্র চলমান প্রাণীরাই তাতে দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়। শুধু তাই নয় উড়ন্ত শত্রু আর ভাসমান মেঘের ছায়ার পার্থক্যটিও তারা বুঝতে পারে। ব্যাঙেদের দৃষ্টিশক্তি বিশ্লেষণ করে বিশেষজ্ঞরা এক নতুন ধরনের 'রাডার' সৃষ্টির স্বপ্ন দেখছেন, যা দিয়ে উড়ন্ত যানগুলির (মিসিল) প্রকৃতি বিচার করে, সেগুলি ক্ষতিকর কি নিরীহ তা জানা যাবে। আধুনিকতম কম্পিউটার যন্ত্রেও তথ্যগুলিকে প্রথমে যন্ত্রের ভাষায় অনুবাদ করে দিতে হয়, কিন্তু ব্যাঙেদের ইলেকট্রনীয় চোখের তারায় সেগুলি প্রতিফলিত হওয়ামাত্রই তাদের অর্থ বোঝা যায়।

মৌমাছিদের পুঞ্জাক্ষিগুলিতে অনেক ছোট ছোট তারা থাকে। এর সাহায্যেই তারা সূর্যের সমবর্তিত (polarised) আলোর নিশানা ধরে পথ চিনতে পারে। 'বালি মাছি'রা (sandflea) আবার চাঁদের অবস্থান দেখে পথ চলে আর রাতের পাখিরা চলে গ্রহ-তারা দেখে। তাদের অনুকরণেই আমরা 'পোলারাইজড্ ওরিয়েন্টেড ইণ্ডিকেটর' যন্ত্র আবিষ্কার করেছি, মেরুপ্রদেশে যেটি খুবই কাজে লাগে। গোবরে পোকার একরাশ চোখের তারাগুলিও এমনভাবে তৈরি যে, আলোর উজ্জ্বলতা কম হলে, তা শুধু একটিমাত্র তারাতেই প্রতিফলিত হয়, যার থেকে তারা বুঝতে পারে শিকারী বা শিকারটি তার তুলনায় কতটা দ্রুতগামী। সেই লব্ধজ্ঞান থেকেই আমাদের আধুনিক দূরত্বমাপক, গতিমাপক যন্ত্রটির জন্ম। টেলিভিশন ক্যামেরার উন্নতিসাধনও করা হয়েছে ক্যাঁকড়ার চোখের অনুকরণে। ছবির খুঁটিনাটিগুলি তাই এত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

মাছিদের ঘ্রাণশক্তি অতি প্রখর। অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে সংজ্ঞাবহ কোষপ্রাচীরের আয়নভেদ্যতাই এর মূল কারণ। অনুসন্ধান চলেছে 'সারমেয় নাসিকা' সৃষ্টির, যার সাহায্যে অপরাধীদের পশ্চাদধাবন আরও সহজ হবে। মানুষ আজ পোকামাকড়দের দেহসৌরভগুলির রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে কৃত্রিম উপায়ে তা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। শুধু তাই নয়, এর সাহায্যে শস্য বিধ্বংসী কীটপতঙ্গদের আকর্ষিত করে বিনষ্ট করাও সম্ভব হয়েছে।

তাপমাত্রার সামান্য হেরফের আমরা কেউই সঠিক অনুধাবন করতে পারি না। কিন্তু মশারা তাদের তিন মিলিমিটার লম্বা শুঙ্গ দুটির তুলনামূলক তাপমাত্রার পার্থক্যটিও সঠিক উপলব্ধি করে আর যেদিক থেকে বেশি দেহতাপের সন্ধান পায় সেই দিকেই ছোটে। আমাদের সবচেয়ে নিখুঁত তাপমান যন্ত্রেও এইটুকু ব্যবধানের মধ্যে অতটুকু তাপমাত্রার পার্থক্যটি নির্ণয় করা সম্ভব নয়। 'র‍্যাটল' সাপেরা ত এক ডিগ্রীর হাজার ভাগের এক ভাগ তাপমাত্রার কম বেশিও অনুভব করতে পারে আর তার সাহায্যেই উষ্ণরক্তের শিকারের পশ্চাদধাবন করে। ওদের দেখেই আমরা 'সাইড উইণ্ডার মিসিল' সৃষ্টি করেছি। শত্রু বিমানের তাপ বিকিরণ থেকে যেটি বিমান-ধ্বংসী কামানের লক্ষ্য স্থির করে। শুধু তাই নয়, নিষ্প্রদীপ শত্রুরাজ্যে লক্ষ্যভেদের জন্যে 'সুপারস্কোপ' নামক 'অবলোহিত দূরবীক্ষণ' যন্ত্রটিও আজ বোমারু বিমানে ব্যবহার করা হচ্ছে। সামরিক প্রয়োজনেই শুধু নয়, অবলোহিত রশ্মি (infra ray) আজ চিকিৎসা শাস্ত্রে 'বেদনাহর' হিসাবে, রন্ধন শিল্পে 'তাপচুল্লী' রূপে এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন বা কুয়াশাবৃত পরিবেশে আলোকচিত্র গ্রহণেও বহুল ব্যবহৃত।

মথেরা তাদের শুঙ্গ দিয়ে দূরত্ব আর দিকনির্দেশনাই শুধু নয়, উচ্চতা পরিমাপও করতে পারে। তাদের শিক্ষা অনুধাবনে সমর্থ হলে, আমাদের বিমানবাহী 'রাডার'-গুলিকে যে আরও উন্নত করা সম্ভব হবে তা বলাই বাহুল্য! বিমান পোতের 'গাইরোস্কোপ'-এ দিক নির্দেশনার সাথে সাথেই ভূমির উচ্চতাটিও জানা যায়। মাছিদের কম্পমান পিছনের পাখনাটি কিন্তু মানুষের গড়া যন্ত্রের চেয়ে অনেক বেশী নিপুণ। বর্তমানে তাই চিন্তা করা হচ্ছে 'গাইরোস্কোপ'-এর ঘূর্ণায়মান চাকাটিকে মাছিদের পাখনার মত কম্পমান করা হবে কিনা। অক্টোপাসের মস্তিষ্ক অনুসরণে সৃষ্টি হয়েছে এক নতুন যন্ত্রের যা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের আকার আকৃতি শুধু চিনতে পারাই যাবে না, মনে রাখাও সম্ভব হবে।

সমশক্তিসম্পন্ন জলযান অপেক্ষা তিমি কি ডলফিনরা অনেক দ্রুত সাঁতার কাটে। অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে এর কারণ ওদের ত্বক আর অধঃত্বকীয় (Subintaneous) স্তরের এক বিশেষ আকৃতি। জলযান মাত্রেই জলের বাধা অতিক্রম করতে হয় আর সেইজন্যেই শক্তি ক্ষয় হয় সর্বাধিক। অপর দিকে, সামুদ্রিক স্তন্যপায়ীদের তরল চর্বিগহ্বরবিশিষ্ট বহিরাবরণটির স্থিতিস্থাপকতা অধিক হওয়ায় চতুঃপার্শ্বস্থিত ঘূর্ণিপ্রবাহগুলি অবমন্দিত (damped) হয়। ফলে জলের বাধা কাটানোর জন্যে তাদের শক্তি অপচয় হয় মাত্র অর্ধেক। আমেরিকার এক রবার কোম্পানী 'ল্যামিফ্লো' বলে এক অনুরূপ যন্ত্র আবিষ্কার করেছে, যা জলপোতে ব্যবহারযোগ্য। ডুবুরীদের পোষাকের আঙ্গুলজোড়া 'হাঁসের পা'গুলি প্রকৃতির অনুকরণেই সৃষ্ট আর আধুনিক ডুবোজাহাজগুলির মুখ যে আর আগের মত ছুঁচালো করা হয় না, তাও করা হয়েছে তিমিদের থ্যাবড়া নাক দেখেই।

ছুঁচোরা তাদের থাবা আর মাথা দিয়ে মাটিতে গর্ত খোঁড়ে। পিঠ দিয়ে শিথিল মাটি পিটিয়ে শক্ত দেয়াল গাঁথে আর পিছনের পা দিয়ে এগিয়ে চলে। তাদের দেখাদেখি রাশিয়ানদের 'যান্ত্রিক ছুঁচো'গুলিও সুড়ঙ্গ কাটার সময় তাদের 'কাটার' যন্ত্র দিয়ে মাটি আলগা করে, 'ওয়র্ম' অংশ দিয়ে দেয়াল গাঁথে আর চারটি 'প্রপেলার'-এর সাহায্যে অগ্রসর হয়। কাজের দিক থেকে অবশ্য তারা এখনও আসল ছুঁচোদের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারেনি। ছুঁচোরা যেখানে ঘণ্টায় ১০৫/১৩০ ফুট গর্ত করে, 'যান্ত্রিক ছুঁচো' সেখানে করে মাত্র ত্রিশ ফুট।

যুগ যুগ ধরে জোনাকিদের আলো আমাদের বিস্ময় জাগিয়ে এসেছে। এ জাতীয় আলোর বিশেষত্ব এতে কোন শক্তির অপচয় হয় না। বৈদ্যুতিক আলোয় যেখানে প্রায় সাতানব্বুই শতাংশ শক্তিই তাপ হিসাবে বিনষ্ট হয়ে যায়, সেখানে এই 'সজীব আলো' থেকে পাওয়া যায় পুরো একশো ভাগ তাপবিহীন আলো। অনেক কৃচ্ছ্রসাধনের পর কৃত্রিম উপায়ে এর সৃষ্টি আজ সম্ভব হয়েছে।

'শীতস্তম্ভ' বা 'হিবারনেসন' পদ্ধতিটি বহুদিন ধরে চিকিৎসাবিদ আর মহাকাশ-বিজ্ঞানীদের আগ্রহ আকর্ষণ করে আসছে। পদ্ধতিটিকে কাজে লাগানোর চেষ্টায় উভয় পক্ষই সমান উদ্যোগী। চিকিৎসাক্ষেত্রে 'হাইপোথার্মিয়া' বলে এক পদ্ধতির উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে, যার দ্বারা দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রাটিকে 98·6° ডিগ্রীর পরিবর্তে 77° ডিগ্রী ফারহেনহীট-এ নামিয়ে এনে সংজ্ঞাহীনতা সৃষ্টি করা সম্ভব। বিশেষ বিশেষ দুরূহ শল্য চিকিৎসায়, যেখানে অন্যান্য সংজ্ঞাহর (anasthetic) ব্যবহার বিপজ্জনক, সেসব ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ অপরিহার্য। 'হাইপোথার্মিয়া'র ক্ষেত্রে রোগীকে কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত সংজ্ঞাহীন করে রাখা সম্ভব। তাই মহাকাশ বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করে দেখছেন হিমীভূত অবস্থাটিকে মাস কয়েক কি বছর কয়েক এ বাড়ানো সম্ভব কিনা। যেক্ষেত্রে খাদ্য পানীয় বা ব্যায়াম কোন কিছুরই প্রয়োজন থাকবে না। দুঃখের বিষয় প্রাণিজগতের কেউ কেউ হিমাঙ্কের তলায় বেঁচে থাকতে পারলেও মানুষের ক্ষেত্রে অদ্যাবধি তা সম্ভবপর হয় নি। কে জানে প্রাণিজগত থেকেই কোনদিন এ প্রশ্নের উত্তর মিলবে কিনা।

সোনা

উদয়ন ভট্টাচার্য

সোনা। এই উজ্জ্বল ধাতুটির আকর্ষণ দুর্নিবার। আর যত সামান্যই হোক এই বস্তুটি নিজের হেপাজতে থাকলে তো কথাই নেই—মনে বল-ভরসা দুই-ই থাকে। এক খণ্ড সোনার লোভে ঘাতকের ছুরিও ঝিলিক দিয়ে ওঠে। সোনাকে কেন্দ্র করে জগতের মুদ্রামান আবর্তিত হয়। সোনার এই অপরিসীম গুরুত্বের কথা অনুধাবন করেই সুবিখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী ও দার্শনিক কাল মার্কস বলেছিলেন: Gold is infact the first metal that man has discovered.

আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছর আগে লিডিয়ার রাজা ক্রোইসাস-এর আমলে প্রথম সুবর্ণ মুদ্রার প্রচলন ঘটে। খৃস্ট-পূর্ব সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে গ্রীসে সুবর্ণ মুদ্রা প্রচলনের নজির পাওয়া যায়। আমেরিকাতে যীশু খ্রীস্টের জন্মের একশ বছর আগেও সুবর্ণ মুদ্রার প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। পৃথিবীর ধনভাণ্ডারের অন্যতম সম্পদ সোনা। সোনার লাতিন নাম Aurum. এই শব্দটি Aurora থেকে এসেছে। এর অর্থ উষা।

প্রকৃতিতে নানা ধরণের পাথরের মধ্যে সোনার সন্ধান পাওয়া যায়। নানা ধাতুর সংগেও সোনা মিশে থাকে। আগ্নেয় শিলা, পাললিক শিলা, অথবা রূপান্তরিত শিলা – সব ধরনের শিলাতেই সোনার অস্তিত্ব বর্তমান। মহাকাশ থেকে ছুটে আসা উল্কা পিণ্ডের ভেতরেও সোনার সন্ধান মিলেছে। সাধারণতঃ আগ্নেয় শিলার 10 ভাগে গড়পড়তা প্রায় তিন থেকে তিয়াত্তর ভাগ সোনা পাওয়া যায়। তবে, সোনা বহন কারী পাথরে সোনার পরিমাণ বেশি থাকে। সোনার আকরিক দু'ভাগে ভাগ করা যায়। পাথরের বুক চিরে জমে থাকা সোনাবাহী শিলা এবং নদীবাহিত সোনা যা কোন কোননদীর বালির সংগে প্রচুর পরিমাণে মিশে থাকে। আমাদের দেশে এই ধরনের নদীর নাম সুবর্ণরেখা। সুবর্ণরেখা নদীর বালিতে সোনার কুচির সন্ধান পাওয়া গেছে। ভূবিজ্ঞানীদের মতে প্রথম ধরনের সোনার উৎস ভূ-গর্ভের গলিত আগ্নেয় শিলা, যার ভেতর অন্যান্য ধাতুর মতো কিছুটা সোনাও থাকে। সোনা-যুক্ত আগ্নেয় শিলা রোদ, বাতাস, বৃষ্টির স্পর্শে পাথর ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে মিশে যায় নদীর বালির সঙ্গে। নদীর স্রোতে পেরোতে পেরোতে বালির ভেতর সোনার ভাগ বাড়তে থাকে। এ-ভাবেই ক্রমে গড়ে ওঠে নদীর বুকে সোনার গুপ্ত ভাণ্ডার। স্থলভাগ ছাড়া জলভাগেও সোনা বর্তমান। কেবল সমুদ্র গর্ভে প্রায় দশ হাজার মিলিয়ন টনের মতো সোনার অস্তিত্ব রয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন। একটন সমুদ্রের লবণাক্ত জল থেকে দশ মিলিগ্রামের মতো সোনা মিলতে পারে। স্বর্ণকণিকা বর্তমান এমন লাভজনক খনিতেও দেখা যায়, শিলার তিন লক্ষ ভাগে গড়পড়তা এক ভাগের মতো সোনা বর্তমান।

প্রস্তর যুগের মানুষ নদীর বেলাভূমিতে পাথর ও বালির মধ্যে এক ধরনের চকচকে পদার্থের সন্ধান পেয়েছিল। পাথর ভেঙ্গে গুঁড়ো করে এক ভারী নমনীয় ধাতু মিললো। প্রস্তর যুগে সেই নমনীয় ধাতু পিটিয়ে নানা আকার দিয়ে তারা পরিধান করতো। পৃথিবীর ইতিহাসে সুবর্ণ অলংকার পরিধানের সেই শুরু। সোনা নমনীয় ও প্রসারনশীল ধাতু। এক আউন্স সোনা দিয়ে প্রায় পঁয়ত্রিশ মাইল লম্বা সরু তার তৈরি করা যায়। আবার এক ইঞ্চি সোনা পিটিয়ে দু'লক্ষ পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ পাতলা পাতও তৈরি করা যায়।

আজ পর্যন্ত জানা সবচেয়ে বড় বিশুদ্ধ সোনার পিণ্ডটি অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়ার অন্তর্গত মলিয়াগল-এ সন্ধান মেলে। 1869 সালে এই পিণ্ডটি পাওয়া যায়। পিণ্ডটি দু'ফুট লম্বা এবং এক ফুট চওড়া। ওজন একশ পঞ্চাশ পাউণ্ড। স্বর্ণ পিণ্ডটির 98·66% ভাগ নিখাদ সোনা। এই স্বর্ণ পিণ্ডটি ন'হাজার পাঁচ শ' বত্রিশ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রয় করা হয়। আজ পর্যন্ত সবচেয়ে লম্বা সোনার পিণ্ডটির ওজন ছয় শ' ত্রিশ পাউণ্ড। লম্বা চার ফুট নয় ইঞ্চি। চওড়া দু' ফুট দু' ইঞ্চি এবং পুরু চার ইঞ্চি। এই স্বর্ণ পিণ্ডটি নিউ সাউথ ওয়েলস্ এর এক খানিগর্ভ থেকে উত্তোলন করা হয়। এই সুবর্ণ আকরিক থেকে এক শ' সাতাশি পাউণ্ড সোনা মেলে। জর্জ হ্যারিসন নামে দক্ষিণ আফ্রিকার এক অধিবাসী সোনার খোঁজে ভাগ্য ফেরাবার মতলবে নানা স্থানে ঘুরতে থাকে। অবশেষে তার পরিশ্রমের অবসান হলো। Wit Watersrand Basin-এ তিনি সোনার সন্ধান পান। খনি খোঁড়া খুঁড়িতে তার অর্থ নিঃশেষ হয়ে যায়। নিরুপায় হয়ে নামমাত্র মূল্যে খনিটি বিক্রি করেন। পরবর্তীতে তার আবিষ্কৃত খনি থেকে পৃথিবীর অধিকাংশ সোনা আহরিত হতে থাকে।

হ্যারিসনের স্বর্ণখনি আবিষ্কারের ছে'চল্লিশ বছর পরে এমান্যুয়েল জ্যাকসন এবং অ্যালান রবার্ট অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটে একটি খনি খোঁড়ার কাজ শুরু করেন। চার হাজার চৌষট্টি ফুট খোঁড়ার পর তাঁরা কপর্দক শূন্য হয়ে পড়েন। খনির কাজ পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে। উনিশশো পঞ্চাশ সালে সেই খনি মাত্র চারশ ফুট খুঁড়েই অপর একজন ভাগ্যান্বেষী সুবর্ণ কণিকার সন্ধান পেলেন। অ্যালান রবার্ট অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন।

সোনার পিছনে ছুটে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েন। মৃত্যুর পর তার শেষকৃত্য বন্ধুরা সম্পন্ন করেন। সবচেয়ে বড় সোনার পিণ্ডটি পাওয়া যায় ইজিপ্টের রাজা তুতেনখামেনের কবর থেকে। পিণ্ডটি ওজনে প্রায় দু'হাজার চারশ' পঞ্চাশ পাউণ্ড। একদা রসায়নবিদরা মনে করতেন, সোনা যোগানোর পরিমাণ বৃদ্ধি করা তেমন কোন ব্যাপার নয়। সহজেই যে কোন ধাতুকে সোনায় রূপান্তরিত করা সম্ভব। আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার নিউক্লিয়ার ফিসন। এই পদ্ধতিতে সীসাকে সোনায় পরিণত করা যায়। নিউক্লিয়ার ফিসন পদ্ধতিতে সীসাকে সোনায় পরিণত করতে গেলে ব্যয় হবে কোটিকোটি টাকা। আর তার বিনিময়ে পাওয়া যাবে এক রত্তি সোনা যার বাজার দর হবে অতি নগণ্য। সুতরাং খরচ পোষাবেনা। এখন পর্যন্ত সীসাকে সোনায় রূপান্তরিত করা স্বপ্নই থেকে গেছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে জার্মানীর প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। অনেক ধার দেনা হয় বিদেশে। ফলে জার্মানীর অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ে। রাষ্ট্রনেতারা দেশের ঋণভার থেকে কিভাবে উদ্ধার পাবেন তা ভেবে ভেবে আকুল। এমন অবস্থায় জার্মান রসায়নবিদ ডাঃ ফ্রিটু হুকার ঘোষণা করলেন, দেশ-মাতৃকার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করবেন। নর্থ সী-এর লবণাক্ত জল থেকে তিনি সোনা আহরণ করবেন। তাঁর সাধু প্রচেষ্টা অবশ্য বাস্তবায়িত হয়নি!

ভারতের সোনার খনিগুলির মধ্যে বিখ্যাত কর্ণাটকের কোলার, হুট্টি ও গাদক। অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুর, তামিলনাড়ুর ওয়াইনাদ। ভারতে বছরে গড়পড়তা দু'হাজার পাঁচশ' কেজি সোনা খনি গর্ভ থেকে উত্তোলন করা হয়। পৃথিবীর মোট সোনার 50% ভাগ আসে আফ্রিকা থেকে। পৃথিবী বিখ্যাত সোনার খনি দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভাল। এছাড়া উত্তর আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, রাশিয়া, কোরিয়া, হাঙেরীতে সোনার খনি রয়েছে।

পলাশ বাড়ী, পোঃ-আলিপুরদুয়ার,
জেলা-জলপাইগুড়ি 73612।

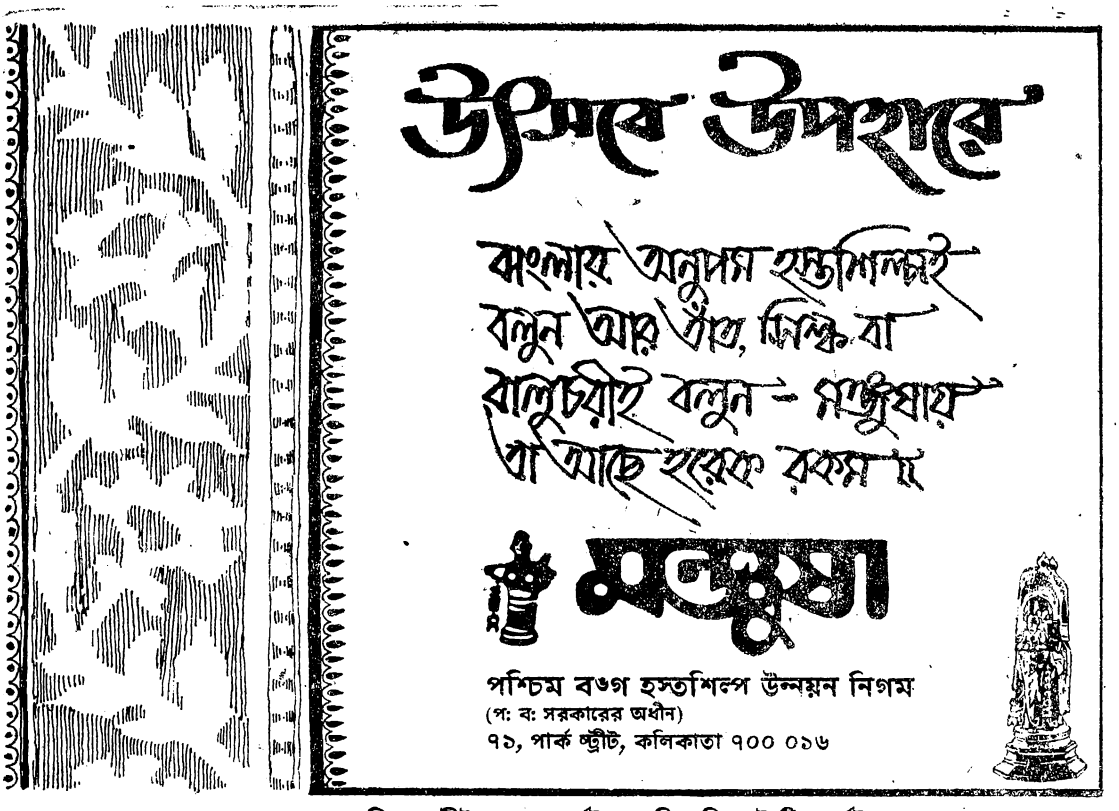

মঞ্জুষা শো রুম : লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, লেক মার্কেট, ঢাকুরিয়া সি-আই-টি মার্কেট, হাওড়া সাবওয়ে, দমদম এয়ারপোর্ট, বারুইপুর, সিউড়ি, বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, বোলপুর, হলদিয়া, দার্জিলিঙ, বনগাঁ, রায়গঞ্জ, মালদা, দিল্লী, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, জয়পুর।

DIOR 5/86

দি ওয়ার অব দি ওয়ার্ল্ডস

বর্ণারূপ-অনিল কর্মকার
চিত্ররূপ-গৌতম কর্মকার

হাঁটছি তো হাঁটছিই। তারপর…
আহ, একটা সরাইখানা মনে হচ্ছে।
তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকলাম।
একটা ইঁদুরে-খাওয়া পাঁউরুটি, সামান্য জ্যাম। ওহ, এই যথেষ্ট। আগের ক'টা দিন তো কিছুই জোটেনি।
খুঁজতে খুঁজতে মিলে গেল কিছু স্যান্ডউইচ আর বিস্কুট…
আহ, অনেক দিন পরে কিছু পেট পুরে খেলাম। কিন্তু ঘুম… ঘুম যে কিছুতেই আসছে না!
পাদ্রী সাহেবের মুখটা বারবার মনে পড়ছে। কিন্তু আমার কী দোষ? উনি যদি অমন পাগলামি শুরু না করতেন, তাহলে তো ওঁকে আঘাত করতে যেত না। একজন অসহায় বৃদ্ধ…
পরের দিন সকালে আবার পথ…
কে জানে, মঙ্গলবাসীরা এখন কোথায়? আমার স্ত্রী-আমার ভাই… ওরা বেঁচে আছে তো?
অবশেষে একজন মানুষকে সামনে দেখলাম।
এই… কে ওখানে? কী করছো?
খবরদার! এগিয়ো না বলছি।
30

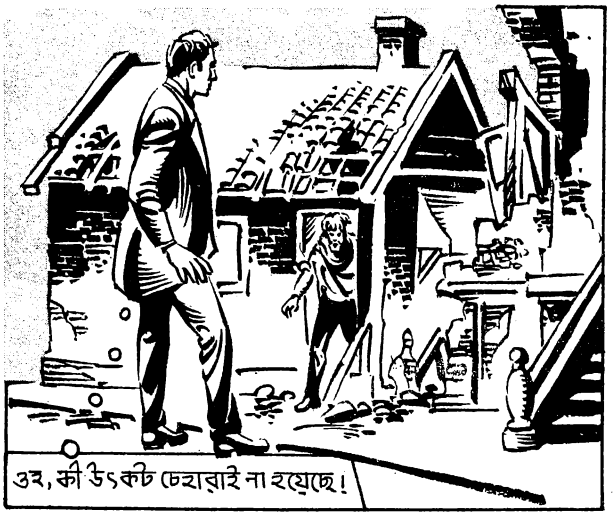
ওহ, কী ভয়ংকর চেহারাই না হয়েছে!

আমার সব খবর লোকটি শুনলো---
কোথায় যাবেন ঠিক করেছেন?
আমার স্ত্রীর খোঁজে।

বলতে বলতে হঠাৎ চমকে উঠলাম আমি।
আরে, তুমি? সেই সৈনিকটি না.. আমার বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলে?
হ্যাঁ, তাইতো! প্রথমে চিনতে পারিনি।

তুমি কি মফস্বলবাসীদের মুখোমুখি পড়েছিলে?
না। তারা মনে হয় -লন্ডনের দিকে গেছে।

ওহ, মানুষের আর কোনও আশাই রইলো না। আমাদের বিজ্ঞানের প্রতি অহঙ্কার-সব ভুয়ো। ওরা কয়েকদিনেই সব শেষ করে দেবে। পৃথিবীতে মানুষ বলে কিছু থাকবে না।
ওদের হাত থেকে বাঁচতে হলে মুক্তি খুঁজতে হবে।

আমি তো ইতিমধ্যেই কাজটা শুরু করে দিয়েছি। আসুন, দেখবেন।
31

রাতটা ওর সঙ্গেই কেটে গেল, তারপর ভোর হতেই আবার পথ।
পথ-ঘাট কালো ছাইয়ে ঢাকা-- এখানে ওখানে পচা গলা মৃতদেহ -- নরকঙ্কাল। কে জানে, লন্ডনের অবস্থা এখন কেমন।
হাঁটতে হাঁটতে চলেছি, হঠাৎ ...
...উলা-উলা-উলা...
সর্বনাশ! এ তো সেই যন্ত্রদানব-গুলোর ডাক। ওরা কি তবে লন্ডন ছেড়ে যায়নি?
...উলা-উলা-উলা...
ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত হয়ে একটা হোটেলের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।
ওহ, কী করুণ আর্তনাদ!
সকাল হোক। এর রহস্য ভেদ করতেই হবে।
32

(22 পৃষ্ঠার পর)

কিছুদিন আগে 'ইলেক্ট্রনিক ক্লাবে'র সদস্য হয়েছে। কি করে 'বিহেভিয়ার অ্যানালাইজার'কে ফাঁকি দিতে হয় তা এই ক্লাবে শেখানো হয়। এতেও যদি মিশ্‌কা 'বিহেভিয়ার এ্যানালাইজারে'র হাত থেকে মুক্তি না পায় তাহলে ওই অভদ্র যন্ত্রটাকে ভেঙে ও টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

আমি ওদের শান্ত করার চেষ্টা করলাম ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমারও মনে হল গন্ধ-যাদুঘর এমন কিছু মহনীয় আবিষ্কার নয়। এক সময় আমরা সবাই শুয়ে পড়লাম।

সেই রাতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি স্বপ্ন দেখলাম—আমি একা শুধু হাতে একটা ভালুক মেরেছি এবং জঙ্গলের মধ্যে তাঁবুর আগুন জেলে সেই ভালুকের মাংস ঝলসে আমরা সবাই খাচ্ছি। কী স্বাদু সেই মাংস। টাটকা মাংস ও ধোঁয়ার গন্ধ আমাদের বিহ্বল করে তুলছিল। মিশ্‌কা একটা বড় মাংসের টুকরো মুখে পুরেছে। লিলি মিশ্‌কার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

স্বপ্নের মধ্যে আমি কী যে সুখী হয়েছিলাম তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।

যখন ঘুম ভাঙল তখন বুঝতে পারলাম মলিকিউলার কাফের ব্যাপার স্যাপার সবটাই ছিল দুঃস্বপ্ন। গল্পটা লিখে ফেললাম। একটা কথা ঠিক যে যন্ত্রকে যদি আমরা জীবনের সব ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রণ করবার অধিকার দিই তাঁর ফল সবসময় ভাল হবে না।

এ ব্যাপারে আমাদের সবাইকেই সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। তাই নয় কি ?

7/4, W2C, Phase—II, Golf Green
Cal-45

ইউনেসকো ও রাষ্ট্রীয়
পুরস্কার প্রাপ্ত

অমরনাথ রায়ের

সায়েন্স
এক্সপেরিমেণ্টস

50টি বিজ্ঞানের মজার মজার এক্সপেরিমেণ্টস—যা হাতে কলমে নিজেরাই পরীক্ষা করতে পারবে। দাম 10 টাকা।

লিফট - অমিয় দাশ

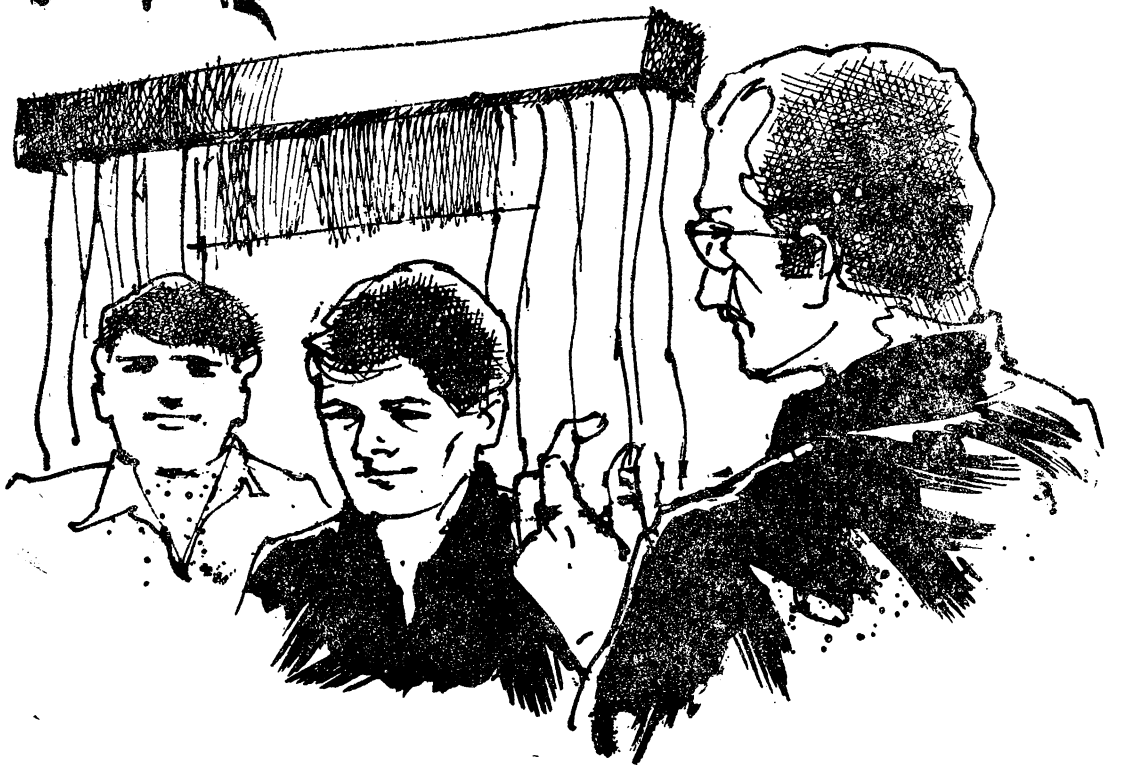

আকাশবাণীর সামনের স্টপেজে তিন বন্ধু বাস থেকে নামল। বল্টু, পিল্টু আর সল্টু। একই ক্লাশে পড়ে ওরা। সঙ্গে ভূগোলের স্যার স্বপনবাবু মানে স্বপন চক্রবর্তী।

এখন ওরা আকাশবাণীর গেটে। ওমা! হেডস্যার আগেই হাজির। ওরা ভেবেছিল আগে গিয়ে ওরা হেড-স্যারকে হারিয়ে দেবে। হেডস্যারই হারিয়ে দিলেন ওদের।

একটু হাসলেন হেডস্যার। ওদেরকে নিয়ে দোতলায় উঠলেন। একটা ঘরে ঢুকে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বললেন। হেসে ভদ্রলোক বললেন, আসুন।

তিনবন্ধু এগিয়ে চলেছে। সঙ্গে হেডস্যার ও স্বপনবাবু। সামনে সেই ভদ্রলোক। তিনবন্ধুর মনে,একটা ভয় ভয় ভাব। ওরা নতুন যে! এমন অভিজ্ঞতা ওদের এই প্রথম। অবশ্য সঙ্গে ভূগোলের স্যার আছেন।

ভূগোলের শিক্ষামূলক আসরে ওরা অংশ নেবে। সেজন্য স্কুল থেকে ওরা নির্বাচিত। আজ রেকর্ডিং। দু একদিন পরে রেডিওতে ওটা প্রচার করা হবে। বল্টুর মনে দারুণ উৎসাহ। কিন্তু ভাবছে—আমি সারা পৃথিবীর লোককে আমার কথা শোনাব।

স্বপনবাবু আগেই বুঝিয়ে দিয়েছেন আলোচনার ব্যাপারটা। প্রত্যেকটা প্রশ্নের সঠিক উত্তর আগেই বলে দিয়েছেন। শুধু একটা নতুন ব্যাপার বল্টুর মাথায় ঘুরছে। এটা শুনলে সবাই অবাক হবে। সারা পৃথিবীতে তাকে নিয়ে হৈচৈ শুরু হয়ে যাবে। ব্যাপারটা কী আগে সে কিছুতেই ভাঙবে না। আসলে এটা তো একটা আবিষ্কার। আবিষ্কারের কথা আগে বলতে নেই। সঠিক জায়গায় সঠিক সময়ে বলতে হয়।

রেকর্ডিং শুরু। স্বপনবাবু পড়াচ্ছেন। প্রশ্ন করছেন। ওরা তিন বন্ধু উত্তর দিচ্ছে। সেই ভদ্রলোক মুচকি হেসে

'স্থল পথে মানে পাতাল পথে যাওয়া যায় স্যার.....'

হাত দিয়ে ঈশারা করছেন আলোচনা চালিয়ে যেতে। হেড-স্যার বাইরে অপেক্ষা করছেন। স্বপনস্যার প্রশ্ন করছেন, আচ্ছা সন্টু তুমি বলতো আমেরিকায় আমরা কিভাবে যেতে পারি।

কেন স্যার, সন্টুর ঝটপট উত্তর, জাহাজে মানে জল-জাহাজে যেতে পারি। আগেকার দিনে লোকে তাই করতো। অবশ্য এতে সময় বেশি লাগতো।

পিন্টু তুমি বলত, আর কিভাবে আমেরিকায় যেতে পারি।

উড়োজাহাজে মানে প্লেনে যেতে পারি। এতে সময় কমলাগে। অবশ্য খরচ বেশি। আজকাল লোকে তাই করে।

স্বপনবাবু এবার প্রশ্ন করেন বল্টুকে। বল্টু তুমি বল, আমরা কি স্থলপথে যেতে পারি?

আমেরিকা স্থল পথে যাওয়া যায় না। কারণ মহাদেশটি আমাদের দেশ থেকে সমুদ্রদ্বারা বিচ্ছিন্ন। স্যার আগেই তা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বল্টু তা বলল না। এইবার সে তার 'বোল্ট' ছাড়বে। সারা পৃথিবী অবাক হবে।

তাই বল্টু গম্ভীর হয়ে বলল, স্থলপথে মানে পাতাল পথে যাওয়া যায় স্যার।

স্বপনস্যার আর রেকর্ডিংএর ভদ্রলোক স্থানকাল ভুলে গেলেন। স্বপনস্যার টানটান হয়ে বসলেন। রেকর্ডিং এর ভদ্রলোক বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে রইলেন।

বল্টু বলল, পৃথিবী গোলাকার। এর ব্যাস পঁচিশ হাজার মাইল। অবস্থানের দিক দিয়ে আমরা আমেরিকার ওপর অথবা আমেরিকা আমাদের নিচে। সেদিন স্যার একটা অফিসে গেলাম। একতলা থেকে দোতলায় উঠলাম। ধরি, দেওয়াল বার ফুট উঁচু। সময় লাগল ক'সেকেণ্ড। বিজ্ঞান তো স্যার আমাদের চাঁদে পৌঁছে দিয়েছে। ভারত থেকে একটা পাতাল লিফট তৈরি করলে আমরা সহজেই আমেরিকা পৌঁছে যাব। স্বপনবাবু বললেন, কিন্তু পাতাল লিফ্‌ট বলে তো কিছু নেই।

বল্টুর উত্তর—নেই বলে হবে না? বিজ্ঞান'ত এখন অনেক কিছু সম্ভব করছে। কোলকাতায় পাতালরেল হচ্ছে। টেম্‌স নদীর তলা দিয়ে পাতালরেল আছে। তাছাড়া ইংলিশ চ্যানেলের তলা দিয়ে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্য পাতাল রেল যাবে বলে ব্লুপ্রিণ্ট হয়েছে। শীঘ্রই কাজ শুরু হবে। তাহলে আমেরিকা ভারত পাতাল লিফ্‌ট হবে না কেন?

স্বপনবাবু একটু থামলেন। বললেন, কিন্তু একটা সমস্যা আছে বল্টু।

কি স্যার ?

ভূগর্ভে প্রায় প্রতি একশো ফুটে গড়ে এক ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপ বাড়ছে তাহলে **লিফ্‌ট** যাবে কেমন করে।

আপনি ঠিক বলেছেন স্যার। আমি তাও ভেবেছি। একটা পথও পেয়েছি। থার্মোফ্লাক্সের সিস্‌টেমে তাপ নিয়ন্ত্রন করে লিফ্‌টের মধ্যে সহনযোগ্য তাপমাত্রা রাখতে হবে।

কিন্তু বড্ড সেতো অনেক খরচ।

চাঁদে যাওয়ার জন্যও স্যার কোটি কোটি ডলার খরচ হচ্ছে। একবার খরচ হবে স্যার। সে খরচ উঠে আসবে।

তা অবশ্য ঠিক। স্বপনস্যার উত্তর দেন। দুদিন পরে রেডিওতে শিক্ষামূলক আসরটা বাজিয়ে শোনানো হল। বল্টুকে নিয়ে সে কি হৈচৈ। নতুন আবিষ্কারের জন্য সবাই তাকে সম্বর্দ্ধনা জানাতে আসছে। সাংবাদিকরা ফটো তুলছে। বাড়িতে যেন মেলা। হৈচৈতে ঘুম ভেঙ্গে যায় বল্টুর। হাইতুলে উঠে বসে বিছানায়। ওমা এতক্ষণ সে তাহলে স্বপ্ন দেখছিল। মনে পড়ে একটু পরে তাকে বেরুতে হবে। আজই রেকর্ডিং ঠিক বেলা বারটা পনের মিনিটে।

এতক্ষণ ঘুমিয়ে থেকে সে যা পেল তাতে জগিয়ে দিতে পারবে সারা পৃথিবীকে।

গ্রাম—কালীনগর, পোঃ—বাওয়ালী, জেঃ—24 পরগনা

হাজারো সিরিজের নতুন সংযোজন

নারায়ণচন্দ্র চন্দ

হাজারো পাখি হাজারো বৈচিত্র্য ২৲

অন্যান্য বই

ডাঃ সিদ্ধার্থ রায় এবং ডাঃ সমীর সাহা

বিজ্ঞানের হাজারো প্রশ্ন ২০৲

নারাণচন্দ্র চন্দ

সমুদ্রের হাজারো বিস্ময় ১৮৲

নারায়ণচন্দ্র চন্দ ও সুনীল ভট্টাচার্য

ইতিহাসের হাজারো ঘটনা ২০৲

ডাঃ সিদ্ধার্থ রায়

প্রাণী জগতের হাজারো খবর ১৫৲

সুধাংশু পাত্র

মহাকাশের হাজারো জিজ্ঞাসা ৫৲

মডেল পাবলিশিং হাউস

2নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলিকাত 73

ক্যুইজ সিরিজের নতুন বই

অসিত কুমার ভৌমিক

সাহিত্য ক্যুইজ ১২·০০

হান্নান আহ্‌সান

স্পোর্টস ক্যুইজ ২০·০০

রঞ্জন প্রকাশন

8/1এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-73

রত্নেশ্বর রায়ের

হাতে কলমে ইলেকট্রনিকস্‌

প্রকাশিত হয়েছে ১২·০০

শৈব্যা গ্রন্থন বিভাগ

8/1এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-73

ক্যালেণ্ডার নিয়ে অঙ্কের মজা

সুবীর চক্রবর্তী

যে কোন বছরের যে কোন মাসের তারিখগুলি নিয়ে অঙ্কের মজা করা যায়। আমি একটি বিশেষ মাস উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরছি।

1987 সালের ফেব্রুয়ারী মাস

রবি	1	8	15	22
সোম	2	9	16	23
মঙ্গল	3	10	17	24
বুধ	4	11	18	25
বৃহস্পতি	5	12	19	26
শুক্র	6	13	20	27
শনি	7	14	21	28

প্রথম মজা ঃ যে কোন সারি থেকে পরপর তিনটে সংখ্যা নাও। প্রথমটিকে 13 দিয়ে, দ্বিতীয়টিকে 7 দিয়ে এবং তৃতীয়টিকে 1 দিয়ে গুণ করে গুণফল তিনটে যোগ কর। যোগফলকে 21 দিয়ে ভাগ করে ভাগফল বলে দাও।

ভাগফল থেকে তিন বাদ দিলে প্রথম সংখ্যাটি পাব।

উদাঃ | 10, 17, 24 |

$10\times 13+17\times 7+24\times 1$

$=130+119+24=273$

$273\div 21=13$; $13-3=10$ (প্রথম সংখ্যাটি)

দ্বিতীয় মজা ঃ 3×3 (অর্থাৎ সারি তিনটে এবং স্তম্ভ তিনটে) বর্গাকারে আছে এমন যে কোন 9টা সংখ্যা নাও। সংখ্যাগুলির যোগফলকে 9 দিয়ে ভাগ করে ভাগফল বলে দাও।

ভাগফল থেকে আট বাদ দিলে প্রথম সংখ্যাটি পাব।

উদাঃ

12	19	26
13	20	27
14	21	28

যোগফল ঃ 180

$180\div 9=20$; $20-8=12$ (প্রথম সংখ্যা)

মজা—3

উপরের মতই যে কোন নটা সংখ্যা নাও। দুটো কর্ণানুযায়ী তিনটে করে সংখ্যা আছে। প্রতি কর্ণের সংখ্যা তিনটে পরপর গুণ করে গুণফল দুটোর বিয়োগফল বার করে বলে দাও।

বিয়োগফলকে 21 দিয়ে ভাগ করলে মাঝের সংখ্যাটি পাব।

উদাঃ $12\times 20\times 28=6720$

$26\times 10\times 24=7280$

$7280-6720=560$

$560\div 28=20$ (মাঝের সংখ্যা)

মজা—4

পাশাপাশি যে কোন দুটো স্তম্ভ নাও যাতে পরপর তিনটে সংখ্যা আছে।

প্রথম স্তম্ভের সংখ্যা তিনটের যোগফলের বর্গ কর। দ্বিতীয় স্তম্ভের সংখ্যা তিনটেরও যোগফলের বর্গ কর। দুটো বর্গফলের বিয়োগফল নাও। সেই বিয়োগফলকে সংখ্যাগুলির যোগফল দিয়ে ভাগ কর। না, না, উত্তর বলতে হবে না—উত্তর আমি জানি 21 হবে।

উদাঃ

2	9
3	10
4	11

$(2+3+4)^2=9^2=81$

$(9+10+11)^2=30^2=900$

$900-81=819$

$2+3+4+9+10+11=39$; $819\div 39=21$

মজা—5

10	17	24
×		×
11	18	25

10, 18 এবং 24 প্রতিটির বর্গ করে সমষ্টি নাও। 11, 17 এবং 25 প্রতিটির বর্গ করে সমষ্টি নাও। এই দুটো ফলের বিয়োগফল বলে দাও।

এর থেকে 15 বাদ দিয়ে দুই ভাগ করলে প্রথম সংখ্যাটি পাওয়া যাবে।

৪২/1, রায়বাহাদুর রোড, বেহালা
কলি-34

'অণু' শব্দের অর্থ কি? পরমাণুই বা কাকে বলে? আজকের দিনের স্কুলের ছেলেমেয়েদের অজানা নয়। কিন্তু অক্টেন' স শব্দটির অর্থ আমরা সবাই জানি কি? ভিনিগার নানারকম খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করতে ব্যবহার হয়। কিন্তু ভিনিগার যে একরকমের অ্যাসিড এ তথ্য আমাদের অনেকেরই অজানা। ম্যাগ্রোমিটার ও ম্যানোমিটার শব্দ দুটি আজকাল আমরা প্রায়ই শুনতে পাই। কিন্তু শব্দ দুটির সঠিক ব্যবহার কি? বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শুধুমাত্র লেখাপড়ার ক্ষেত্রেই নয়, আমাদের ব্যবহারিক জীবনেও অনেক শব্দ আমরা শুনতে পাই—যার প্রকৃত অর্থ অনেকেই জানি না। এইরকম প্রায় 2500 শব্দের চিত্রসহ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা রচনা করেছেন প্রবীণ বিজ্ঞান লেখক অমরনাথ রায়। যে গ্রন্থ শুধু কিশোর কিশোরীদেরই নয়, অনেক বয়স্ক পাঠকেরও কৌতূহল মেটাবে।

অমরনাথ রায় সংকলিত

একখণ্ডে সম্পূর্ণ সচিত্র ॥ দাম ২৫৲

সমরজিৎ কর সম্পাদিত

স্টুডেন্টস

সমরজিৎ কর সম্পাদিত

এক খণ্ডে সম্পূর্ণ ॥ দাম ৫০.০০

বিষয় সূচী

পৃথিবীর জন্ম ॥ পৃথিবীর পরিচয় ॥ পৃথিবীর গাছপালা ॥ পৃথিবীর প্রাণী ও মানুষ ॥ পৃথিবীর ইতিহাস ॥ দেশ বিদেশের সাহিত্য ॥ শিল্প-স্থাপত্য-ভাস্কর্য ॥ অসীম সমুদ্র ॥ গ্রহ থেকে কোয়াসার ॥ গণমাধ্যম ॥ গণিতবিদ্যার কথা ॥ পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ॥ চিকিৎসা বিজ্ঞানের কথা ॥ প্রযুক্তিবিদ্যা ॥ খেলাধুলা ॥ পৃথিবী থেকে আকাশ ॥ পদার্থবিদ্যার কথা ॥ রসায়নের কথা ॥ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী ॥

প্রায় অর্দ্ধ সহস্র সাদা কালো ও রঙিন চিত্র সমৃদ্ধ ॥

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কলি-৯

স্টেডিহ্যাণ্ড টেস্টিং গেম

পার্থসারথি চক্রবর্তী

এই সংখ্যায় তোমাদের এমন একটা ইলেকট্রনিক সার্কিটের কথা বলব যেটা শুধু মজারই নয়, এর থেকে তোমার হাত কত steady সেটাও জানা যাবে। এই মজার ইলেককট্রনিক্সের খেলার নাম দেওয়া যাক—স্টেডি হ্যাণ্ড টেস্টিং গেম (Steady hand testing game)। এখানে

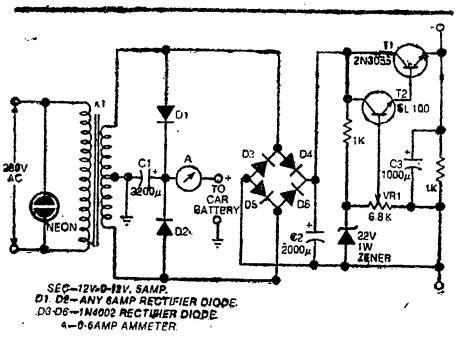

একটা তারের লুপ-কে (ছবি দেখ) একটা আঁকাবাঁকা তারের মধ্যে দিয়ে নিয়ে আসতে হবে। তোমাকে কায়দা করে ঐ লুপ আঁকাবাঁকা তারের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের মধ্যে দিয়ে না ছুঁয়ে নিয়ে আসতে হবে। এই সার্কিটে আছে একটা মাত্র 1C 555 ; এর থেকে যখনই লুপের সঙ্গে আঁকাবাঁকা তারের সংযোগ ঘটবে তখনই একটা শব্দ এবং আলো দেখা যাবে। এই সার্কিটে একটা Memory রয়েছে, কাজেই খুব সামান্যতম দুটো তারের মধ্যে ছোঁয়া লাগামাত্রই তুমি দুটো সিগন্যাল-ই (শব্দ এবং আলো) পাবে।

সার্কিটটি এমন সুন্দরভাবে তৈরি করতে হবে যাতে সেটা একটা সাবানের প্লাস্টিক বাক্সর মধ্যে ধরে যায়। লুপ এবং বাঁকা তারের shape ও size সহজেই বদলে দেওয়া যেতে পারে এই মজার ইলেকট্রনিক্সের খেলা আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য।

1C 555 এমন ভাবে connect করবে যাতে সেটা নিজে থেকেই (Self triggered mode) স্কোয়ার ওয়েভ জেনারেটারের মতো কাজ করতে পারে। এই ধরনের mode-এ এর স্কোয়ার ওয়েভ উৎপত্তির জন্য কেবল একটা মাত্র রেজিস্টর চাই, দুটোর বদলে। VR_1 এবং C_1 Oscillation frequency-এর নির্দেশ দেয়—যেটা $1/(1{\cdot}4R_1C_1)$। তুমি প্রয়োজন মনে হলে শব্দের টোন পরিবর্তনের জন্য একটা পোটেনসিওমিটার ব্যবহার করতে পার R_1-এর বদলে। লাউডস্পীকার এবং LED আউটপুটের সঙ্গে সংযোগ করতে হবে অবশ্যই R_2 সিরিজ রেজিস্ট্যান্সের মাধ্যমে।

অসিলেটর সুইচ যথাক্রমে অন্ ও অফ্ হতে থাকবে যখন ভোল্টেজ reset pin 4-এ ঢুকবে। যখন pin-4 এর ভোল্টেজ 0·06V-এর চাইতে বেশি হবে তখনই অসিলেটর কাজ করতে শুরু করবে। কিন্তু যখন এটা 0·06V-এর নিচে চলে আসবে তখন অসিলেসন বন্ধ হয়ে যাবে।

কিন্তু যদি লুপ এবং বাঁকা তারের মধ্যে কখনও সামান্যতম সংস্পর্শ ঘটে তাহলে ক্যাপাসিটর C_2 চার্জড হয়ে যাবে এবং অসিলেটর কথাটি নেই, সঙ্গে সঙ্গে কাজ করতে শুরু করে দেবে ; ভোল্টেজও তখন ঢুকবে যদিও দুটো তারের সংস্পর্শ নাও থাকে। R_2-এর মধ্য দিয়ে C_2 ডিসচার্জ করতে থাকবে এবং সবশেষে যখন ভোল্টেজ প্রয়োজনীর মাত্রার নিচে নেমে যাবে তখনই অসিলেটর থেমে যাবে। কাজেই লুপ ও তারের অতি সামান্যতম স্পর্শেও শব্দ ও আলো দুটোর সিগন্যালই দেখা যাবে।

time constant $R_1 \times C_2$ নির্দেশ দেবে কতক্ষণ ধরে এই সিগন্যাল চলবে। তুমি ইচ্ছে করলে C_2 বাড়িয়ে দিয়ে অন্-পিরিয়ড বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পার। কিন্তু এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার—সেটা হল খুব বেশিক্ষণ সিগন্যাল দেখা দিলে আবার খেলার মজাটাই মাটি হয়ে যেতে পারে। নিচের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেইরকম বিভিন্ন ধরনের লুপ ব্যবহার করতে পার। লুপের ব্যাস কমিয়ে দিলে খেলাটা জমবে ভাল।

6V অথবা 9V ব্যাটারী প্যাক ব্যবহার করলে সমস্ত প্রোজেক্টটা বেশ খুশি মতো এদিক-ওদিক নেওয়া চলবে। প্রয়োজন মনে করলে তুমি ব্যাটারী এলিমিনেটরের সাহায্য নিতে পারো। 5V—15V ; ভোল্টেজ সাপ্লাই বেশি হলে রেজিস্টর R_2-এর মান সেই মতো বাড়াতে হবে।

ইউক্লিডের জ্যামিতি প্রসঙ্গে

ইন্দ্রনীল ঘোষ

আমার প্রিয় বিষয় হল জ্যামিতি ; তাই অবসর সময়ে কাগজ পেন্সিল নিয়ে Figure তৈরি করতে থাকি —এটা আমার Hobby। কাজ করতে করতে এক আশ্চর্য জিনিস দেখলুম যাতে মনে হয় Eucled-এর জ্যামিতি ভুল এবং তা পেরেছি ইউক্লিডের মাধ্যমেই। কিভাবে পেরেছি তাই দেখুন :

উপরের চিত্রটিতে $\angle BAC = \angle BDC$ (Angles in the same segment are Congruent)—ইউক্লিড এটাই প্রমাণ করেছিলেন ; কিন্তু আমি প্রমাণ করেছি $\angle BDC > \angle BAC$। AD যুক্ত করুন এবং বর্ধিত করুন O বিন্দু পর্যন্ত।

এবার দেখুন,

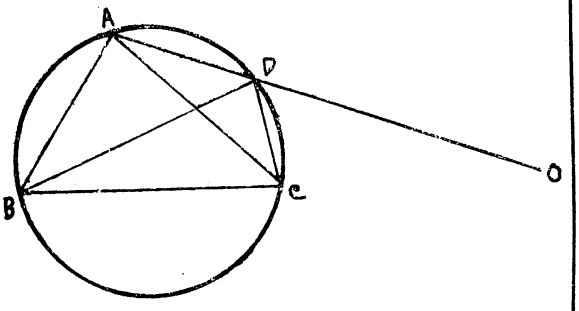

$\triangle BAD$-র Ext. $\angle$বা বহিঃস্থ $\angle BDO >$ অন্তঃস্থ বিপরীত $\angle BAD$.....(i)

আবার $\triangle CAD$-র Ext. $\angle$ বা বহিঃস্থ $\angle CDO >$ অন্তঃস্থ বিপরীত $\angle CAD$.....(ii)

$\therefore$ (i) ও (ii) হইতে,

$\angle BDO - \angle CDO > \angle BAD - \angle CAD$

বা, $\angle BDC > \angle BAC$

এ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

ইন্দ্রনীল ঘোষ, দশম শ্রেণীর ছাত্র
সেন্ট টমাস ডে স্কুল, কলি-14

জানা-অজানা / শুভাশিষ ঘোষ

জোনাসের বাহাদুরী

আমেরিকার বাড়িতে বাড়িতে এখন যন্ত্রমানবের চাহিদা প্রচুর। এই রোবটটির নাম হল জোনাস। এটি মানুষের নানা উপকার সাধন করতে পারে চাহিদাটা ঠিক এই কারনেই। জোনাসের কাজকর্ম ওখানকার মানুষকে দারুন ভাবে বিস্মিত করেছে। (1) বাড়িতে কেউ না থাকলে জোনাস একাই বাড়ি পাহারা দেবে। (২) বাড়িতে অতিথি এলে সেই অবিকল মানুষের গলায় অভ্যর্থনা জানিয়ে অতিথিকে ঘরে বসাবে। (৩) চা, জলখাবার তৈরী করার কাজেও নাকি এই জোনাস খুব পটু। (৪) কেউ কোনো কুকর্ম করলে জোনাস তাকে উচিত শিক্ষা দিতেও পিছপা হয় না।

পাকস্থলির মজা

সম্প্রতি আমেরিকার মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের জর্নালে একটি চাঞ্চল্যকর খবর প্রকাশিত হয়েছে। খবরটি এই রকম ঃ জনৈক রোগী—দেহে প্রচণ্ড যন্ত্রণার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হল। ডাক্তাররা শত চেষ্টা করেও তার যন্ত্রণার উপশম করতে পারলেন না। অবশেষে অপারেশন টেবিলে এনে তার পাকস্থলি কাটা হল। কেটে তো ডাক্তাররা অবাক। তার পাকস্থলিতে জমা ছিল—দুটি চাবির রিং, তিনটি পুঁতির মালা, তিনটি চিমটে, ছাব্বিশটি ধাতুর মেডেল, চারিটি নখ কাটার যন্ত্র, 88টি ধাতুর পয়সা ও আরো রকমারী জিনিস ! এই সমস্ত জিনিসপত্রের ওজন ছিল প্রায় দু কেজি।

রাতারাতি মোটা

রাতারাতি মোটা হতে কাউকে দেখছ ? দেখনি তো ! হ্যাঁ এই রকমই একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল কালিফোর্ণিয়ায়। ওখানকার বাসিন্দা আর্থার নো'র এর জীবনেরই ঘটনা এটা। 196 সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত তার ওজন ছিল 273 কেজি। কিন্তু মজার কথা ঐ সালেরই জুলাই মাসে তার ওজন দাঁড়াল 409 কেজি। অর্থাৎ তার ওজন 137 কেজি বেড়ে গেল মাত্র পাঁচ মাসের ভিতরেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যর বিষয় কি জান—ঐ মাসেই সে মারা গেল।

নতুন রেকর্ড

সম্প্রতি দক্ষিণ ফ্রান্সের অধিবাসী স্যামসন বেত্তে একটি বিশ্ব রেকর্ড করেছেন। মাত্র তিন মিনিটেই কুড়িটি টিনের পাত্রের ঢাকনা দাঁত দিয়ে খুলে ফেলবার কৃতিত্বের অধিকারী তিনি। দৃশ্যটি ওখানকার টেলিভিসনে সরাসরি দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এত কম সময় নিয়ে এতগুলো ঢাকনা এক সাথে খুলে ফেলে রেকর্ড করায় স্যামসনের নাম উঠেছে গীনেস বুক অব ওয়াল্ডের পাতায়।

C/o সৌরেন্দ্রনাথ ঘোষ, কেশবপুর, জেলা-হুগলী।

সূর্যমুখী

এণাক্ষী বিশ্বাস

সূর্যমুখীর আদিনিবাস ইউনাইটেড স্টেটস্ অব আমেরিকার মেক্সিকোতে। ইংরাজীতে সান ফ্লাওয়ার নামে সুপরিচিত। এই সূর্যমুখীর বৈজ্ঞানিক নাম হেলিয়েনথাস এনাস (Helianthus annus) উদ্ভিদ বিজ্ঞানী লিনিয়স এই সূর্যমুখী ফুলটিকে বর্ণনা করেন এবং নামকরণ করেন। গ্রীক ভাষায় Helios কথার অর্থ

সূর্য এবং anthus means ফুল। এর থেকেই ইংরাজীতে সান ফ্লাওয়ার নামটির উৎপত্তি এবং ইহা অ্যাসটারেসী গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। কার্যত দেখা যায় সূর্যমুখী ফুলের চলন সূর্যের আলোকের গতিপথকে অনুসরণ করে। আর এই ধরনের চলনকে হেলিওট্রপিজম বা সূর্যবৃত্তি বলে।

সূর্যমুখী বর্ষজীবী বীরুৎ উদ্ভিদ। উচ্চতায় প্রায় 60 থেকে 260 সে.মি. অবধি হয়। পাতাগুলি বড় ও রোমশ হয়। নিচের দিকে পাতাগুলি অভিমুখ ওপর দিকের পাতা একান্তর বিন্যাসে সজ্জিত থাকে।

পুষ্পবিন্যাস ক্যাপিটিউলম। ইহা সরল অনিয়ত পুষ্পবিন্যাসের অন্যতম। এই ধরনের অনিয়ত পুষ্পবিন্যাসের মঞ্জরীদণ্ড অপেক্ষাকৃত ছোট কিন্তু আগাটি বিস্তৃত হয়ে সাধারণত কুব্জপৃষ্ঠ পুষ্পাধারে পরিণত হয়। এই পুষ্পাধারের ওপর অসংখ্য পুষ্পিকা বা খুব ছোট ছোট ফুল থাকে এবং এরা মঞ্জরী পত্রাবরণ দিয়ে বেষ্টিত থাকে বলে পুষ্পবিন্যাসটিকে একটি ফুল বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহা বহু ছোট ফুলের সমষ্টি। মাঝখানের ঘন গাঢ় রঙের পুষ্পিকা প্রান্তের দিকের পুষ্পিকাগুলি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়। মাঝখানের পুষ্পিকাগুলিকে মধ্যপুষ্পিকা এবং বাহিরের দিকের স্বর্ণহলুদ রঙের পুষ্পিকাগুলিকে প্রান্তপুষ্পিকা বলে।

ঘন গাঢ় রঙের মধ্যপুষ্পিকাগুলি উভলিঙ্গ হয় এবং মঞ্জরীপত্র থাকে। ইহা সম্পূর্ণ ফুল। পুংকেশরের যুক্ত পরাগধানী থাকে। অপরদিকে দেখা যায় সূর্যমুখীর প্রান্তপুষ্পিকা গুলি ক্লীব ফুল। কেবলমাত্র দৃষ্টি আকর্ষক স্বর্ণহলুদ রঙের জিহ্বাকৃতি বড় পাপড়ি ও কেবলমাত্র গর্ভপত্রের মধ্যে গর্ভাশয় থাকে।

সূর্যমুখীর পরাগসংযোগ উল্লেখযোগ্য। প্রথমেই বলেছি মধ্যপুষ্পিকা উভলিঙ্গ হয়। উভলিঙ্গ ফুলে পুংকেশর ও গর্ভপত্র একই সময় পরিপক্ব হলে স্বপরাগযোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।এজন্য পুংকেশর ও গর্ভপত্র বিভিন্ন সময়ে পরিপক্ব হয়ে স্বপরাগযোগ হতে দেয় না। এই পদ্ধতিকে বিষম পরিণতি বলে। তাই দেখা যায় পুংকেশর গর্ভপত্র পরিপক্ব হওয়ার আগেই পরিপক্ব হয়ে রেণু বিক্ষিপ্ত করে। ইহা প্রপুংপরিণতি নামে পরিচিত।

সূর্যমুখীর ইতর পরাগযোগ ঘটে। কোন কীট বা পতঙ্গ সূর্যমুখী ফুলের রেণু অপর কোন সূর্যমুখী ফুলের পরিপক্ব গর্ভমুণ্ডে পতিত করে পরাগযোগ ঘটায়।

অতঃপর বীজ প্রস্তুত হয়। বীজগুলি চ্যাপ্টা ও প্রায় 1 সে.মি. লম্বা এবং কালো থেকে গাঢ় খয়েরী রঙের হয়।

সূর্যমুখী ফুল থেকে ভাল মধু প্রস্তুত হয়। তাছাড়া রঞ্জক পদার্থ, তেল ও তন্তু পাওয়া যায়। বীজ, পাখি ও পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

এই উদ্ভিদটির ক্রোমোজোম সংখ্যা $2n = 34$।

ফটো ঃ সুবলকৃষ্ণ দে।

এই পৃথিবীর কার কত দিন

প্রানিজগতের পৃথিবীতে বসবাসের একটা নির্দিষ্ট সময় রয়েছে।

পাশের ছবিটি দেখলে একটা আন্দাজ হবে তোমাদের প্রাণিজগতের কিছু কিছুর মোটামুটি আয়ু কেমন। অল্প কিছু প্রাণীর মোটামুটি আয়ু দেওয়া হয়েছে এখানে। অবশ্য জীবাণুরাই সবচেয়ে বেশি আয়ুর অধিকারী। জীবাণুর আয়ুর কাছে কচ্ছপের 100 বছর কিছুই নয়।

মানুষ মোটামুটি গড়ে 70 বছর বাঁচে। কিন্তু শুনলে অবাক হবে যেসব সেল বা কোষ দিয়ে মানুষের দেহ গঠিত তাদের আয়ু কিন্তু অনেক-অনেক কম। প্রতিনিয়তই মানবদেহে কোষের মৃত্যু আর নতুন কোষের জন্ম হয়েই চলেছে। তোমাদের কিছু কোষের আয়ুর ধারণা দিচ্ছি। (1) ব্লাড্ সেল বা রক্ত কণিকার মধ্যে রেড্ সেল বা লোহিত কণিকার আয়ু 120 দিন। Lymphocytes-এর গড় আয়ু 1 বছর। অন্যান্য শ্বেত কণিকা 10 ঘণ্টার মত বাঁচে। Platelets-এর আয়ু 10 দিন। (2) পাকস্থলীর কোষের আয়ু 2 দিন। (3) Colon cells এর আয়ু 3-4 দিন। (4) Spermatozoa 2-3 দিন। (5) চামড়ার কোষ বাঁচে 19-34 দিন। সুতরাং অনবরত কোষ বদল হয়ে চলেছে মানুষের শরীরের মধ্যে। কেবলমাত্র ব্রেনের কোষ কখনোই বদল হয় না। তবে সে কোষ মানুষের এত প্রচুর আছে যা সারা জীবনের বুদ্ধিশুদ্ধির জন্য যথেষ্ট।

লেখা ও ছবি : সমীর মণ্ডল

কাইনেটোফোন আবিষ্কার

জিজার দিদি আজ প্রথম বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাবার অনুমতি পেয়েছে। সেজেগুজে টা-টা করে বেরিয়ে যাবার পরই জিজা কাঁদতে কাঁদতে ওপরে এল। ওকে ফেলে কেন সিনেমা গেছে দিদি? কি আর করা, জিজাকে ভোলাতে গল্প বলতেই হল—সিনেমার গল্প।

টেলিফোন যিনি আবিষ্কার করেছিলেন সেই এডিসন ভাবলেন এবার নতুন কিছু একটা করা যাক। 1889 এ তৈরি হ'ল 'কাইনেটোগ্রাফ'—চলচ্চিত্রের প্রথম ক্যামেরা। খু-উ-ব অল্প সময়ের মধ্যেই তাতে অ-নে-ক ছবি উঠত, যাতে একটা কাজকে ভেঙে ভেঙে দেখানো যায়। তারপর এল 'কাইনেটোস্কোপ'—আধুনিক প্রোজেক্টারের পূর্ব-পুরুষ। তাতে ক'রে এত তাড়াতাড়ি পরপর ছবি দেখানো যেত যে টুকরো টুকরো ছবি মনে না হয়ে মনে হত, একটাই ঘটনা ঘটছে। 1912 সালে আবিষ্কার করা হল 'কাইনেটোফোন'—আর তখনই প্রথম কথা বলল ছায়াছবি। ক্যামেরায় তোলা ছবি প্রোজেক্টারে লাগানো হয়। প্রোজেক্টারের ভেতরকার বাল্বের আলোয় ফিল্মের ছায়া গিয়ে পড়ে পর্দায়। ফিল্মের ধারে ছোট ছোট ফুটো থাকে। প্রোজেক্টরের চাকা বেয়ে ফিল্মও ঘুরতে থাকে। আর ছবিও নড়তে থাকে। আর ফিল্মের দুধারে আয়রন অক্সাইডের কোটিং থাকে। সেখানে শব্দ ধরা পড়ে।

গল্প তো শেষ হয়ে গেল। কিন্তু দিদির ফিরতে তো অনেকক্ষণ। ততক্ষণ জিজাকে সামলাই কি ক'রে। তোমরা কিছু সাহায্য করতে পারো?

অলয় ঘোষাল ও ঋতুপর্ণ ঘোষ

হামিং বার্ড

যে সুন্দর পাখিটির ছবি দেখতে পাচ্ছ, নাম তার 'হামিং বার্ড'। অধিকাংশ হামিং বার্ডই উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলের বাসিন্দা। কিছু কিছু এই পাখি উত্তর আমেরিকাতেও বাস করে। শীতকালে উত্তর আমেরিকা ছেড়ে এরা মেক্সিকো এবং মধ্য আমেরিকায় চলে যায়। এদের পালকের রং বড় সুন্দর। সূর্যের আলো পড়লে রঙীন পালকগুলি সুন্দর উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করে। বিদেশী পাখি 'সুইফট'-এর নিকট আত্মীয় এই হামিংবার্ড। হামিং বার্ডের ওড়ার মধ্যে একটা মাধুর্য আছে, যা অন্যান্য পাখিদের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। এদের পা দু'খানি খুবই দুর্বল। সেই কারণে হামিং বার্ডের পক্ষে মাটিতে হেঁটে বেড়ানো খুবই কষ্টকর। এরা এক ফুল থেকে আরেক ফুলে উড়ে গিয়ে বসে, ফুটন্ত ফুলের মধু পান করে। ঠোঁটটি বেশ লম্বা ও ঈষৎ বাঁকানো বলে এবং লম্বা জিভ থাকার জন্যে তার সাহায্যে এদের ফুলের মধু সংগ্রহ করা সহজতর হয়। উড়বার সময় এদের ডানা দুটি অত্যন্ত দ্রুত সঞ্চালিত হয়। তার ফলেই গুঞ্জন ধ্বনি শোনা যায়। প্রায় তিনশো রকম হামিং বার্ড আছে। এদের অধিকাংশই বাস করে দক্ষিণ আমেরিকায়। দীর্ঘতম হামিং বার্ড কুড়ি সেণ্টিমিটার লম্বা হয় এবং তার অর্ধেকটাই লেজ। এদের বাস আণ্ডিজ পর্বতমালায়। আর ক্ষুদ্রতম হামিং

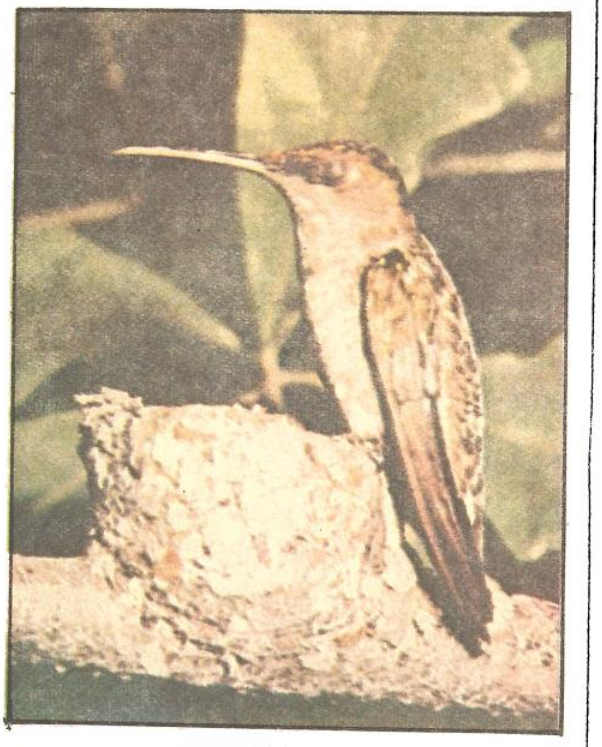

বার্ড লম্বায় আড়াই সেণ্টিমিটার হয়। এদের বাস কিউবায়। গাছের ডালে এরা বাসা বোনে এবং স্ত্রী-পাখি সেই বাসায় মাত্র দু'টি সাদা ডিম পাড়ে।

এই রচনাটির সঙ্গে যে রঙীন ছবিটি দেখতে পাচ্ছ, নাম তার 'এমু'। এমু পাখি হ'লেও উড়তে পারে না,

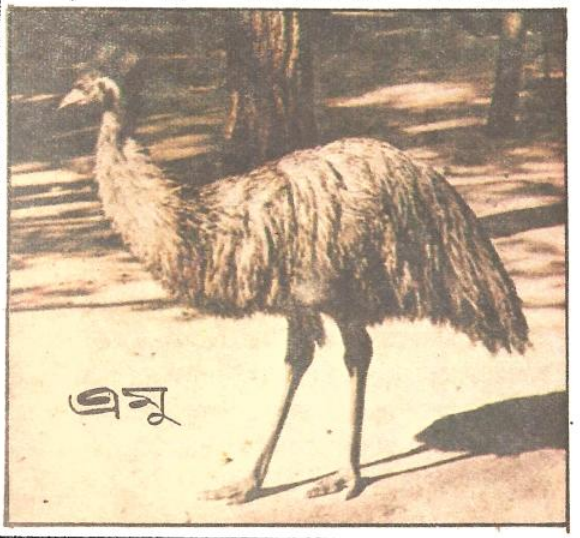

আর আমাদের দেশেও একে দেখতে পাওয়া যায় না। এরা অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের বাসিন্দা এবং উটপাখির নিকট আত্মীয়। তৃণভূমির প্রায় সব রকম উদ্ভিজ্জ বস্তুই এদের খাদ্য, অর্থাৎ এরা সম্পূর্ণ নিরামিশাষী। এক একটি এমুপাখি 1·5 মিটার পর্যন্ত লম্বা হ'য়ে থাকে। এদের দেহ বাদামী রঙের পশমী লোমে আবৃত থাকে। স্ত্রী-এমু পাখি ডিম পাড়ে। এক-একটি ডিম প্রায় 13 সেণ্টিমিটার লম্বা হয়। পুরুষ এমু পাখি ডিমে আট সপ্তাহ ধরে তা দিয়ে বাচ্চা ফোটায়। শিশু এমুপাখির দেহে ক্রিম এবং গাঢ় বাদামী রঙের লম্বা লম্বা দাগ থাকে। ডিম থেকে বেরুবার তিন-চার দিনের মধ্যেই শিশু-এমু দাঁড়াতে পারে। স্ত্রী-এমু মাটিতে আঁচড়ে গর্ত করে তার মধ্যে এক সঙ্গে সাত থেকে তেরোটি পর্যন্ত ডিম পাড়ে। এদের প্রতিটি পায়ের তিনটি আঙ্গুলই সমান মাপের হয়। এরা উদ্ভিদ-ভোজী। শস্যই এদের প্রধান খাদ্য।

অমরনাথ রায়

ছোটদের দপ্তর

পরিচালনায় জয়ন্ত দত্ত

জানুয়ারি '87-এ প্রকাশিত জুনিয়ার ফোটো ক্যুইজ কনটেস্ট-এর সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিন জন পুরস্কৃত হবে :

1. **শিবব্রত ঘোষ**, প্রযত্নে, সুখরঞ্জন ঘোষ, "লীলা নিকেতন", পোস্ট—সিউড়ি, জেলা—বীরভূম।
2. **সীমা সরকার**, প্রযত্নে, অমলেশ চন্দ্র সরকার, গ্রাম + পোস্ট—ফতেপুর, জেলা—নদীয়া।
3. **মহুয়া দাঁ**, প্রযত্নে, মৃণালকান্তি দাঁ, গ্রাম + পোস্ট—জামালপুর, জেলা—বর্ধমান।

জানুয়ারি '87-এ প্রকাশিত জুনিয়র ফোটো ক্যুইজ কনটেস্ট-এর সঠিক উত্তর আরও যারা দিতে পেরেছে :

কলকাতা : পার্থপ্রতিম রাহা, অরিত্র পাল, অনির্বাণ দাস, তপন মিস্ত্রি, অংশুমান মুখার্জী, সৌমেন মণ্ডল, দেবজ্যোতি দেবনাথ, তন্ময় মহাপাত্র, শ্রীমন্ত চৌধুরী, ইন্দ্রনীল দত্ত, বিজয়ানন্দ দাস, রসুই দাস, সুপর্ণা দত্ত। **24-পরগনা :** রূপম ভৌমিক, কুনাল গোস্বামী, ইন্দ্রনাথ মল্লিক, অনুপম চক্রবর্তী, হারুন আলি জমাদার, ঝুমা চ্যাটার্জী, শুভঙ্কর বিশ্বাস, মনোজিত মণ্ডল, শ্রীকুমার দে। **হাওড়া :** চন্দ্রা দত্ত, দেবব্রত পাল, দেবব্রত মণ্ডল। **হুগলী :** অপূর্ব ভট্টাচার্য, প্রণব চ্যাটার্জী। **বর্ধমান :** কিরণশঙ্কর রাউত, আশিস রায় মণিমালা রেজ, সুদর্শন ব্যানার্জী, অনির্বাণ গুপ্ত। **মেদিনীপুর :** বিকাশ কুমার মণ্ডল, মৃণাল কান্তি কুণ্ডু, বিশ্বজিৎ, সাহু, মীরা সেনাপতি, শুভ্র চৌধুরী, প্রদীপ সরখেল, শান্তিময় দাঁ। **নদীয়া :** কাকলি রায়চৌধুরী, এস. এস. মুখার্জী।

জানুয়ারি '87-এ প্রকাশিত জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট-এর সবকটি-প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিনজন পুরস্কৃত হবে :

1. **ওঁকার দাশ**—প্রযত্নে, অতুলচন্দ্র দাশ, তমলুক মহকুমা হাসপাতাল, জেলা—মেদিনীপুর।
2. **সীমা সরকার**—প্রযত্নে, অমলেশ চন্দ্র সরকার, গ্রাম + পোস্ট—ফতেপুর, জেলা—নদীয়া।
3. **মহুয়া দাঁ**—প্রযত্নে, মৃণালকান্তি দাঁ, গ্রাম + পোস্ট—জামালপুর, জেলা—বর্ধমান।

জানুয়ারি '87-এ প্রকাশিত জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আরও যারা দিতে পেরেছে :

কলকাতা : অসীমকৃষ্ণ দাস। **24-পরগনা :** দ্বৈপায়ন মজুমদার, মনোজিৎ মণ্ডল, শ্রীকুমার দে। **হাওড়া :** জ্যোতির্ময় মান্না, লিপি চক্রবর্তী, মানবকুমার রীত। **হুগলী :** শুভ্রা মোদক। **বর্ধমান :** তরুণ তপন গরাই, চন্দ্রা রায়, মণিমালা রেজ, সুপ্রিয় রেজ, হাসি লাহা। **মেদিনীপুর :** শুভ্র চৌধুরী, জয়ন্ত দত্ত মজুমদার। **বীরভূম :** অলোককুমার চক্রবর্তী।

জানুয়ারি '87-এ প্রকাশিত সিনিয়র ফোটো ক্যুইজ কনটেস্ট-এর সঠিক উত্তর (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিন জন পুরস্কৃত হবে :

1. **সুব্রত ভাণ্ডারী**—10, জোড়াবাগান স্ট্রীট, কলকাতা-700 006
2. **পার্থপ্রতিম ব্যানার্জী**—A/8, গভঃ হাউসিং এস্টেট, পোস্ট—সোদপুর, উত্তর 24-পরগনা।
3. **মুরারি মোহন রক্ষিত**—টিকুরহাট, পোস্ট—লাকুটি, জেলা—বর্ধমান।

জানুয়ারি '87-এ প্রকাশিত সিনিয়র ফোটো ক্যুইজ কনটেস্ট-এর সঠিক উত্তর আরও যারা দিতে পেরেছে :

কলকাতা : দীপঙ্কর ব্যানার্জী, মহুয়া ঘোষ, অভিজিৎ গাঙ্গুলী। **24-পরগনা :** প্রমিত ঘোষ, তমাল ভট্টাচার্য্য, কাশীনাথ মল্লিক। **হাওড়া :** বরুণ বিশ্বাস। **হুগলী :** প্রবীর দাস। **বর্ধমান :** মণিদীপা দাঁ, সিদ্ধার্থ শঙ্কর ব্যানার্জী, রানা সেনগুপ্ত, সুধাংশু ঘোষ, স্নিগ্ধা উপাধ্যায়, অসীমা ব্যানার্জী। **মেদিনীপুর :** সুজনবন্ধু সামন্ত, সুব্রতেশ রায়, চৈতালি কুণ্ডু, দিলীপ দাস, সোমনাথ কুণ্ডু। **নদীয়া :** শ্রীদাম সরকার। **মুর্শিদাবাদ :** কাফিল আলম সিদ্দিকী।

জানুয়ারি '87-এ প্রকাশিত সিনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিনজন পুরস্কৃত হবে ঃ

1. **শ্রীদাম সরকার**—প্রযত্নে, বৈকুণ্ঠ সরকার, গ্রাম—মিলননগর, পোস্ট—বগুলা, জেলা—নদীয়া—741502
2. **সুজনবন্ধু সামন্ত** -প্রযত্নে, সুশীলকুমার সামন্ত, গ্রাম—কিসমত জগন্নাথ চক্, পোস্ট—মাগুরী জগন্নাথচক, পাঁশকুড়া আর. এস., জেলা—মেদিনীপুর।
3. **কুন্তল রেজ**—প্রযত্নে, প্রভাতকুমার রেজ, গ্রাম + পোস্ট—মন্তেশ্বর, জেলা—বর্ধমান।

জানুয়ারি '87-এ প্রকাশিত সিনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আরও যারা দিতে পেরেছে ঃ

কলকাতা ঃ দীপঙ্কর ব্যানার্জী, তারকনাথ দাস, দীপ্তিরাণী সামন্ত। **24-পরগনা ঃ** রুনু নিয়োগী। **হাওড়া ঃ** শুভাশিস মিত্র। **হুগলী ঃ** অনিন্দ্য সরকার, মনোজিৎ দত্ত। **বর্ধমান ঃ** সুদীপ কুমার দাস, শ্রাবণী গরাই, আশিস মণ্ডল, সুধাংশু ঘোষ। **মেদিনীপুর ঃ** মৃণালকান্তি বেরা, সুব্রতেশ রায়, শান্তনু চৌধুরী, অভিজিৎ সরকার, দিব্যেন্দু সরকার। **জলপাইগুড়ি ঃ** মৃত্যুঞ্জয় সিন্‌হা। **দার্জিলিং ঃ** ধ্রুবদাস মহলানবীশ।

বি. দ্র.—জানুয়ারি '87-এ প্রকাশিত সিনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট-এবং 11 এব- 12 প্রশ্নে মুদ্রণ প্রমাদ বশতঃ প্রতিযোগিতার মধ্যে ঐ দুটিকে ধরা হলো না।

জানুয়ারি '87-এ প্রকাশিত আই-কিউ টেস্ট-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রদানের জন্য (আগে আসার ভিত্তিতে) যারা সার্টিফিকেট পাবে ঃ

1. **শিপ্রা পাল**—প্রযত্নে, স্নেহাংশু পাল, পোস্ট—চাকদহ (নেতাজী পার্ক), নদীয়া।
2. **অচ্যুত কুমার দাঁ**—প্রযত্নে অসিত কুমার দাঁ, চীফ ওয়েল ফেয়ার অফিসার, নিউ ট্যোবাকো কোম্পানি লিমিটেড, পোস্ট—কামারহাটি, বি.টি. রোড, কলকাতা-700 058।
3. **অনুপম বসু সরকার ঃ** প্রযত্নে, অম্লান কান্তি বসু সরকার, কাঁটাপুকুর, পোস্ট—মগরা, জেলা—হুগলী।
4. **অপালা ভট্টাচার্য ঃ** প্রযত্নে, অমলকুমার ভট্টাচার্য, পোস্ট—চুঁচুড়া, জেলা—হুগলী।
5. **জয়ন্ত ঘোষ দস্তিদার ঃ** প্রযত্নে, সুলেখা বসু, 57, বিবেক নগর, পোস্ট—টিটাগড়, উত্তর 24-পরগনা।
6. **মিঠু ঘোষ ঃ** প্রযত্নে, হরেকৃষ্ণ ঘোষ, গ্রাম—জয়রামপুর, পোস্ট -শুকদেবপুর, জেলা—24-পরগনা 743503।
7. **দীপককুমার বাগ**—প্রযত্নে, সুধাংশুশেখর বাগ, গ্রাম—খালোড়, পোস্ট—বাগনান, জেলা—হাওড়া।
8. **জয়া দেব**—P-11, বাঙ্গুর অ্যাভেনিউ, ব্লক-A, কলকাতা-700055।
9. **দেবমাল্য নিয়োগী**—প্রযত্নে, অশোককুমার নিয়োগী,11/4, রামানুজম রোড, দুর্গাপুর-713205, বর্ধমান,
10. **রুনু নিয়োগী ঃ** প্রযত্নে, রবীন্দ্রনাথ নিয়োগী, গ্রাম—পানপুর, পোস্ট—নারায়ণপুর, জেলা—উত্তর 24-পরগনা—743126।

জানুয়ারি '87-এ প্রকাশিত আই-কিউ-টেস্ট-এর সমাধান

1. হীরাকুদ—অ্যালুমিনিয়াম ; লুধিয়ানা—শীতবস্ত্র ; কেরল—কয়ার ; মহীশূর—রেশম ; উত্তর প্রদেশ—চামড়া ; বিহার—অভ্র ; আসাম—চা। 2. 800 ; 3. টাইম টেবিল ; 4. (c) সোডিয়াম সালফেট ; 5. (b) না।

ডিসেম্বর '86-এ প্রকাশিত আই-কিউ-টেস্ট-এর সমাধান

1. a) যেহেতু প্রত্যেক মানুষই ঈশ্বরের সন্তান তাই তারা পরস্পর ভাই ভাই। অতএব ভাই ভাইকে সাহায্য করবে।
2. ছত্রাক জাতীয় জীবাণু। 3. 1%।
4. (a) Intelligence Quotient. (b) All India Radio. (c) Save Our Souls. (d) Victoria Cross. (e) British Broadcasting Corporation.
5. 1927 খ্রীস্টাব্দে। পুরস্কৃত দুজনের নাম অভিনেতা Emil Jannings এবং অভিনেত্রী Janet Gaynor.

** বি. দ্র.—মুদ্রণপ্রমাদ বশতঃ ডিসেম্বর '86-এ প্রকাশিত আই-কিউ-টেস্ট-এর সমাধান ফেব্রুয়ারি '87 সংখ্যায় প্রকাশিত হয়নি। মার্চ '87 সংখ্যায় সেটি প্রকাশিত হলো,—এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

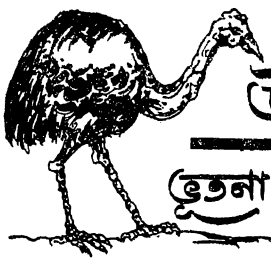

পাখি হলেও উড়তে পারে না

ভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়

পাখিরা আকাশে ওড়ে। কিন্তু সব পাখিই তা পারে না। কথাটা শুনলে অবাক হতে হয় বটে কিন্তু কথাটা খুবই সত্য। যেমন ধরো গৃহপালিত হাঁস, মুরগী পাখিদের মতো পাল্লা দিয়ে আকাশে উড়তে পারে না। তবে এরা কিছুটা উড়তে পারলেও, উটপাখি আর পেঙ্গুইন পাখি একদম উড়তে পারে না। তবে এরা খুব জোরে ওদের ডানা দুটোর সাহায্যে দৌড়ুতে পারে। এরা ঘণ্টায় প্রায় ৪৫ মাইল বেগে দৌড়ুতে পারে।

জীববিজ্ঞানে যতো রকমের পাখি আছে এই উটপাখি যার ইংরাজি নাম অস্ট্রিক তাদের মধ্যে বৃহত্তম। পাখিদের রাজ্যে এক চরমতম বিস্ময় এদের অনায়াসেই বলা যেতে পারে। একটি উটপাখির উচ্চতা হচ্ছে আট ফুট। চোখ দুটো বেশ বড় তবে মাথাটা দেহের তুলনায় খুবই ছোট। চক্ষু গোলকের ব্যাস দুই ইঞ্চির মতো, গলা তিন ফুট লম্বা হয়ে থাকে। এদের শরীরের ওজন হচ্ছে একশো কেজি। ডানা দুটো শরীরের তুলনায় ছোট, তবে এরা উড়তে পারে না। তবে উরু আর মজবুত পা দিয়ে এরা ঘোড়ার মতো দৌড়ুতে পারে। এদের বাসভূমি হচ্ছে আফ্রিকা মহাদেশ। এরা যা পায় তাই খেয়ে জীবনধারণ করে।

উট পাখির স্বভাব মোটেই শান্ত নয়—ভয়ংকর। ভয়ংকর মেজাজ নিয়েই এরা সদাসর্বদা চলাফেরা করে থাকে। এদের লাথির জোর এতো যে তা দিয়ে এরা যে কোনো মানুষের বুকের পাঁজরা ঝাঁঝরা করে দিতে পারে। তবে চোখের সামনে একটা কাঁটা গাছ ধরলে এরা সহজেই কাবু হয়ে পড়ে এবং এই পদ্ধতিতেই এরা শিকারীর কাছে অতি সহজেই ধরা পড়ে। মেয়ে উটপাখি দিবাভাগে এবং পুরুষ উটপাখি রাতে ডিমে তা দেয়। একটা ডিমের ওজন দেড় কেজি ও তার দৈর্ঘ্য প্রায় ছয় ইঞ্চির মতো। উটপাখির ডিম সিদ্ধ হতে সময় লাগে চল্লিশ/পঁয়তাল্লিশ মিনিট। ডিমের ভেতর বাচ্ছা উটপাখি ঘা দিয়ে তার ডিমের খোলস ফাটিয়ে বাইরে আসে এবং তখন সে তার নাভির রস খেয়ে বেঁচে থাকে।

উটপাখির পালক খুবই বিচিত্র বর্ণের। এই পালক দিয়ে মানুষের নিত্য ব্যবহার্য নানা ধরনের পণ্যদ্রব্য তৈরি হয়ে থাকে। এদের চামড়া দিয়ে জুতা, হ্যাণ্ডব্যাগ, গ্লাভস ইত্যাদি জিনিসপত্র তৈরি হয়ে থাকে। উটপাখির মাংস দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসীদের খুবই প্রিয় ও সুস্বাদু খাদ্য। এরা এদের ডিমও খেয়ে থাকে খুবই আনন্দের সঙ্গে। উট-পাখির শুকনো মাংস সাহারা মরু অঞ্চলের লোকেদের একমাত্র প্রধান খাদ্য।

এবার বলছি পেঙ্গুইন পাখির কথা (এরাও পাখি হয়েও উড়তে পারে না। পেঙ্গুইন হচ্ছে আসলে একধরনের আজব পাখি। এদের ডানা দুটো পাখনায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে বলেই এরা উড়তে পারে না; তবে খুব জোরে ছুটতে পারে এবং জলে সাঁতার দিতেও এরা খুবই ওস্তাদ। না, এরা কিন্তু মোটেই মেরু অঞ্চলে থাকে না। দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের ঠাণ্ডা অঞ্চলে এরা বাস করে। এবং দলবদ্ধ ভাবেই বাস করে। তবে এমপায়ার পেঙ্গুইনদের সাধারণতঃ দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে বাস করতে দেখা যায়। এদের পেট সাদা, পিঠ আর গায়ের রং কালো চোখের চারিদিকে একটা সাদা বৃত্ত আছে। তাই এদের কখনো মনে হবে কোনো মানুষ সাদা জামা এবং কালো কোট পরে দাঁড়িয়ে আছে তাই না? এদের উচ্চতা এক মিটারের মতো। এদের শরীরের ওজন হচ্ছে 40-50 কেজির কম নয়। শৈত্য প্রবাহের মধ্যেই এরা থাকতে ভালবাসে সর্বপ্রকার বাধা-বিপত্তিকে তুচ্ছ করে। শরীরের জমানো চর্বি খেয়ে এরা বেঁচে থাকে মাসের পর মাস, বাইরে থেকে কোনো খাদ্য না খেয়েও।

পেঙ্গুইনের খাদ্য হচ্ছে সমুদ্রের জলের নানা ধরনের স্কুইড ছোট ছোট মাছ। 1 60 মি.লি. মিটারের লম্বা এক ধরনের চিংড়ি হচ্ছে এদের খুবই প্রিয় খাদ্য। এই মাছকে বলা হয় ক্রিল। এই ক্রিল মাছ খুবই প্রোটিন সমৃদ্ধ তাই পেঙ্গুইনেরা এই মাছ খেতে এতো ভালবাসে। ডাঙায় এদের শত্রু হলো স্কুয়া পাখি এবং জলে এদের শত্রু হলো শাল মাছ। অধিকাংশ সময় এদের হাতেই এরা মারা পড়ে। ডিমে তা দেয় পুরুষ পেঙ্গুইন আর স্ত্রী পেঙ্গুইন খাবারের সন্ধানে বাসা ছেড়ে অনেক দূরে চলে যায়। 65 দিন পরে ডিম থেকে বাচ্চা বের হয় এবং পিতার শরীরের লালা জাতীয় খাদ্য খেয়ে জীবনধারণ করে তারা, এদের মতো দলবদ্ধ ভাবে বাস করার ধারা জীবজগতে বড় একটা দেখা যায় না। তবে এদের স্বভাব খুবই নির্বোধ। কতকটা ভেড়ার মতো আর দলনেতা যেদিকে যাবে সেদিকেই এরা বিনা দ্বিধায় গমন করবে তাতে মৃত্যু হলেও পিছপা হবে না।...

কবিতা ভবন
আন্দুল, হাওড়া-711302

★ এখন পড়াশুনোর সময়
★ এখন এগিয়ে যাবার সময়
★ পড়তে পড়তে দুর্বল হলে চলবে না
★ শরীর ও মন ভেঙ্গে পড়লে চলবে না

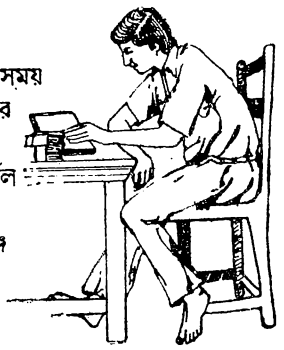

স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি, মনের একাগ্রতা বাড়াতে এবং শরীর সুস্থ ও সতেজ রাখতে ব্যবহার করুন।

ব্রেনোলিয়া

স্মৃতিশক্তি ও স্বাস্থ্য সতেজ রাখার উৎকৃষ্ট টনিক

ব্রেনোলিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস
১৩ মহারাজা ঠাকুর রোড, কলিকাতা-৩১
ফোন নং ৪১-০০৬৯

গিলোটিন নাম হল কেন?

উমাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

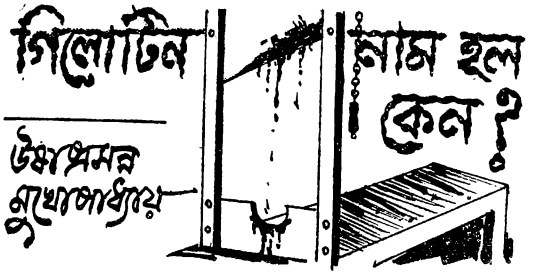

কোন কোন মানুষের ধারণা ফরাসী বিপ্লবের সময় যে ভয়ঙ্কর গিলোটিন যন্ত্রে রাজবংশীয় বহু মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছিল সেটি প্রাণদণ্ড কার্যকর করার সবচেয়ে নিষ্ঠুর পদ্ধতি ; শুধু তাই নয়, আবিষ্কারকের নামানুসারেই রাখা হয়েছে ঐ যন্ত্রের নাম। ফ্রান্সে গিলোটিন যন্ত্র যখন প্রথম চালু হয় তখন তার নাম 'গিলোটিন' ছিল না। এমন কি, ঐ যন্ত্র প্রথম ফ্রান্সে প্রচলিতও হয়নি। ডাঃ লুই ইটালীতে প্রচলিত ঐ যন্ত্র দেখে ফ্রান্সেও তা' ব্যবহারের পরামর্শ দেন (1789)। ইটালীতে কয়েক শতক ধরে 'মুণ্ডচ্ছেদ যন্ত্র' রূপে ঐ গিলোটিন ব্যবহৃত হত। ফ্রান্সে যখন প্রথম প্রচলিত হ'ল তখন নাম রাখা হয় 'লুইসন' (Luison)।

গিলোটিন নাম হয় ডাঃ যোশেফ ইগনাক গিলোটিন (1736-1812) নামে এক সমাজ সেবী, জন দরদী ডাক্তারের নামানুসারে ; তিনি অপরাধীকে নানা ভাবে যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করার বিরুদ্ধে ফ্রান্সে প্রবল জনমত গড়ে তুলেছিলেন। অষ্টাদশ শতকে তেমন নানা প্রথা নানা দেশেই চালু ছিল। গিলোটিনের অনুরোধে ফ্রান্সের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি সরকারী ভাবে ঐ প্রাণদণ্ড দানের যন্ত্রটি বেছে নেন 1792 সালের 25 মার্চ।

গিলোটিনে প্রথম যে প্রাণ দেয় সে কোন রাজনৈতিক অপরাধী নয়, একজন ডাকাত—নাম ম্যাশিয়ে পেলিসিয়ের (pelissier)! 'রেন অব টেরর' বা 'ত্রাসের আমল' নামে ফরাসী ইতিহাসের যে অধ্যায়টি চিহ্নিত সেই যুগে অন্তত আট হাজার 'সম্ভ্রান্ত মস্তক' গিলোটিনের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে লুটিয়ে পড়েছিল পথের ধূলায়! ফ্রান্সে সত্তর শতক পর্যন্ত অবশ্য গিলোটিনই ছিল প্রাণদণ্ড কার্যকর করার প্রধান সরকারী যন্ত্র।

নিজে নিজে কর

রিমোট অপটিক্যাল সুইচ

নির্মলেন্দুবিকাশ পাত্র

নামটা পড়ে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ কি কাজে যন্ত্রটি ব্যবহার করা হবে। এই সার্কিটের সাহায্যে রাত্রে তোমরা অনায়াসেই একটি টর্চ বাতির সাহায্যেই বড় বাল্ব জ্বালাতে পারবে।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ :—

Semi conductors :—D_1, D_2, D_3—IN 4002

TR_1—SL 100

Switch—S_1—Rush to off switch

Resistor :—

$R_1 = 33\Omega$

$R_2 = 1\text{Meg}\Omega$ preset

R_3 = L. D. R.

Capacitors—C,—1000μF 25v.

Transformer—T_1—6-0-6v. stepdown.

Relay—RL_1—400Ω 1 contact

যন্ত্রটির দুটি অংশ :—একটি এলিমিনেটার ও অন্যটি Switching Circuit। Part A এর বদলে 6v. এর ব্যাটারি ব্যবহার করা যেতে পারে। দ্বিতীয় অংশের প্রাণ কেন্দ্র হল L. D. R. বা Light dependent resistance। এতে আলো পড়লে রোধ কমে এবং অন্ধকারে রোধ বেশী হয়। 1 meg Ω Preset-টির সাহায্যে SL 100 এর বেসের নেগেটিভ বায়াস কমানো বা বাড়ানো যায়। Relay এর Back E. M. F. এড়ানোর জন্য D_3 ব্যবহার করা হয়েছে।

সমস্ত কাজ শেষ হলে L. D. R. টিকে বাল্বের মোটামুটি কাছেই রাখতে হবে। যদি সাধারণ অবস্থাতেই অর্থাৎ আবছা অন্ধকারেই আলো জ্বলে তবে meg Ω Preset টি ঘুরিয়ে তা নিভিয়ে দিতে হবে। তবে এই সার্কিটকে একমাত্র রাত্রেই ব্যবহার করা যেতে পারে।

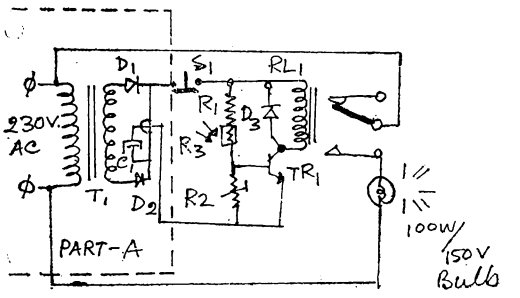

CIRCUIT DIAGRAM

এবার L. D. R. এর উপর একবার টর্চের আলো ফেললেই SL 100 সক্রিয় হবে ফলে Relay on হবে ও বাল্ব জ্বলবে। পরে এই আলোই SL 100কে সক্রিয় রাখবে। আলোটি নেভাতে হলে Push to off সুইচটি একবার চাপ দিয়ে ছেড়ে দিলেই চলবে।

নির্মলেন্দুবিকাশ পাত্র
পো + ভিলেজ : চামড়াইল, হাওড়া

গত মে 1986 থেকে এপ্রিল '87 পর্যন্ত কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাতায় প্রকাশিত যাবতীয় মডেলের একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে আগামী বার্ষিক অনুষ্ঠানে। এপ্রিল '87 সংখ্যায় এ বিষয়ে সংবাদ প্রকাশিত হবে।

পরিচালক : ছোটদের দপ্তর

শব্দকূট

পল্লব নাথ

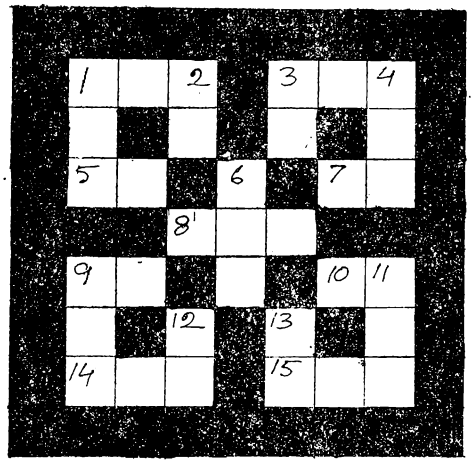

পাশাপাশি ঃ

1. এক প্রকার কৃত্রিম তন্তু। 3. আলোকের গতিবেগ সর্বপ্রথম নির্ণয়কারী। 5. "মিসিং লিঙ্ক"-এর সঙ্গে সংযুক্ত যে প্রাণী। 7. বংশগতির বাহক। 8. S. I. এককের নাম। 9. ধমনীর রক্তের রঙ। 10. 'ডাই-ইলেকট্রিক'—একটি পদার্থ। 14. পুরনো ভাঙ্গা কাচকে যা বলে। 15. 'অ্যানিলিন পার্পল'-এর আবিষ্কর্তা।

উপর নীচ ঃ

1. 'ইনডোল অ্যাসিটিক অ্যাসিড' কাহার রাসায়নিক প্রকৃতি। 2. সমুদ্রে দূরত্ব মাপার একক। 3. Fumicino বিমান বন্দর যেখানে অবস্থিত। 4. ক্যানাডা উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত আঠালো পদার্থ। 6. বংশগতি সংক্রান্ত সূত্রের আবিষ্কর্তা। 9. প্রথম মহাকাশচারী। 11. ঋণাত্মক ত্বরণ। 12. স্তম্ভমূল যুক্ত একটি উদ্ভিদ। 13. একটি সম্ভ্রান্ত ধাতু।

8. লিংকরোড, শিলচর-6
কাছাড়, (আসাম)

অটোগ্রাফসহ গ্রন্থ উপহার

বুদ্ধি নিয়ে খেলা

পার্থসারথি চক্রবর্তী

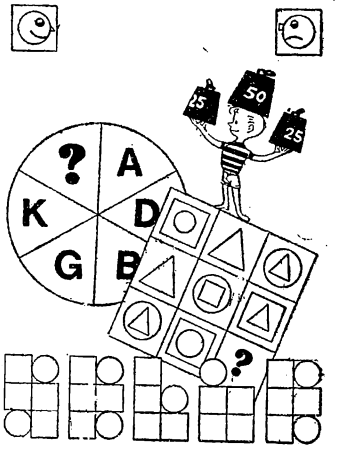

ফেব্রুয়ারি সংখ্যার সিনিয়র ও জুনিয়র কুইজ কনটেস্টের উপহার

বিমান বসুর নক্ষত্র পরিচয়

ফেব্রুয়ারি সংখ্যার সিনিয়র ও জুনিয়র ফটো কুইজের উপহার

পার্থসারথি চক্রবর্তী বুদ্ধি নিয়ে খেলা

গত এক বছরে প্রকাশিত সিনিয়র, জুনিয়র কুইজ কনটেস্ট, ফটো কুইজ ও আই কিউ টেস্টের সফল প্রতিযোগীদের এপ্রিল-মে '87 মাসে অনুষ্ঠিতব্য বার্ষিক অনুষ্ঠানে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট অর্পণ করা হবে।

—সম্পাদক

প্রতিযোগিতার কুপন

সিনিয়র/জুনিয়র/জুনিয়র কুইজ কনটেস্ট, আই কিউ টেস্ট, এবং ফোটো কুইজ-এর উত্তরের সঙ্গে এই কুপনটি কেটে পাঠাতে হবে।

আমি..

ঠিকানা..

বয়স..............................শ্রেণী......................

বিদ্যালয়ের নাম..

আই কিউ টেস্ট / সিনিয়র / জুনিয়র কুইজ কনটেস্ট ফোটো কুইজ-এর উত্তর পাঠালাম।

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ— চোরাবালি কি ?

অশোককুমার পাল গ্রাঃ বাঘাসন পোঃ মালডাঙা, বর্ধমান

উঃ নদী কিংবা সমুদ্র গর্ভে অথবা তীরভূমিতে কোথাও কোথাও এমন এক ধরণের বালির স্তর থাকে যার উপর হাঁটতে গেলে পা বসে যায় এবং এক এক জায়গায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে ধীরে ধীরে পা দুটো যেন ক্রমশঃ পুঁতে যেতে থাকে। তখন পা'কে টেনে তোলাও যেন দায় হয়ে পড়ে। কেবল তাই নয়, অনেক সময় পাহাড়ী এলাকায় ধস নামলে বা রাস্তাঘাট বসে গেলে কাদা স্রোতের তীব্র প্রবাহ বেরিয়ে আসে এবং এক বিশাল এলাকাকে প্লাবিত করে। গল্পেও পড়া গেছে, মরুভূমির বুকে বালির আবর্তের মধ্যে ডুবে যায় উটসমেত যাত্রীরা। মরুভূমির এই ব্যাপারটা কতদূর সত্য, তা জানা নেই। তবে পাহাড়ী এলাকায় যে ধস নামে এবং নদী ও সাগরের তীরে কোথাও যে বিপদ ডেকে আনে-তা সত্য। আর এই ধরণের ব্যাপার যেখানে যেখানে ঘটে সেসব জায়গায় আমরা চোরা বালির অস্তিত্বকে ধরেনি।

সমুদ্র কিংবা নদীর তীরে যেখানে চোরাবালি আছে সেখানে বালুর স্তরটা এমন যে বালুকণাগুলো ঘন সন্নিবিষ্ট নয় এবং ভিতও শক্ত নয়। কণাগুলো গায়ে শক্তভাবে আটকে না থেকে আলগাভাবে অবস্থান করার জন্য পরস্পরের মধ্যে ফাঁক থাকে যথেষ্ট। আর ঐ ফাঁকগুলো অধিকার করে রাখে জল। ফলে আরও আলগা হয়ে থাকে সেই স্তরটি। তাছাড়া নদী ও সাগরে স্রোত থাকায় ফাঁকের ভেতরেও একটা স্রোত চলতে থাকে। যার জন্য বালুকণাগুলো কিছুতেই গায়ে গায়ে লেগে থাকতে পারেনা। অনুরূপ স্তরে উপর থেকে সামান্য চাপ পড়লেই বালুকণাগুলোর ভেতরের ফাঁকটা সংকুচিত হয় এবং ফাঁকের ভেতরে যে জল থাকে তা চাপের প্রভাবে বেরিয়ে যায়। আর ঐ কারণেই মানুষ জন চোরাবালির আবর্তে নিচের দিকে তলিয়ে যেতে থাকে।

পাহাড়ী এলাকায় চোরাবালি একটু অন্য ধরণের। এক্ষেত্রে কোথাও কোথাও দুটি কঠিন শিলাস্তরের মাঝে গভীর ও বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে অবস্থান করে আলগা বেলে মাটির স্তর। এদের মধ্যেও ফাঁক থাকে যথেষ্ট এবং জলস্রোতও প্রবহমান। ঐ জলটা আবার উপরের বর্ষার জল চুঁইয়ে প্রবেশ করে থাকে। উক্ত স্তরের কোন অংশের উপর দিয়ে যদি রাস্তা তৈরি হয় তাহলে যানবাহনের চাপে এবং কম্পনে মাটির স্তর বসে যায়। অথবা স্তরের দুপাশের কঠিন শিলাস্তর থেকে যদি ধস নামে তাহলেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। ফলে ভেতরের কাদা ও বালি সমেত জল উপরে বেরিয়ে আসে এবং যানবাহন, কখনও কখনও এক বিরাট এলাকাকে প্লাবিত করে।

এখানে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় যে, আমাদের কলিকাতা শহরের তলায়ও অনেক জায়গায় চোরাবালির স্তর আছে। তাই এখানে গগনচুম্বী অট্টালিকা তৈরি করতে গেলে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন হয় এবং গভীর কংক্রীটের দৃঢ় ভিত নিয়ে ঘর খাড়া করতে হয়।

প্রঃ— টিকটিকির লেজ খসে কেন এবং লেজ খসে গেলে গঠিত হয় কি ভাবে ?

রনধীর কর্মকার, 19/46 গুরু নানক রোড-পূর্বাপুর 4

উঃ—কেবল টিকটিকি নয় কেঁচো, ফড়িং প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর জীবের লেজের দিকের অংশটা বিচ্ছিন্ন করে দিলে বিচ্ছিন্ন অংশটি আপনা হতেই পুনর্গঠিত হয়ে যায়। তাছাড়া হাইড্রাকে লম্বালম্বিভাবে কেটে পুনরায় যদি জোড়া দেওয়া যায় তাহলে পুরাণের সেই জরাসন্ধের মত জোড়া লেগে যায়। অপরদিকে প্ল্যানেরিয়া নামে জলাভূমির এক ধরণের কৃমির (ঈষৎ বাদামী রঙের এবং লম্বায় প্রায় দু সেন্টিমিটার মত) মাথাটা কেটে ফেললেও লঙ্কেশ্বর রাবণের মত নতুন মাথা গজিয়ে ওঠে। অবশ্য এমনটি কোন উন্নত শ্রেণীর জীবদেহের মধ্যে দেখা যায় না।

হাইড্রা ও প্ল্যানেরিয়ার দেহ, ফড়িং কিংবা টিকটিকির লেজের দিকটা প্যারেনকাইমা নামক এক জাতীয় কোষ দ্বারা গঠিত। উক্ত কোষগুলি আবার সুসংবদ্ধভাবে অবস্থান করছে না। পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে আলগাভাবে লেগে থাকে মাত্র। এ ছাড়াও আর এক ধরণের কোষ থাকে যার নাম রিজেনারেশন সেল বা পুনর্গঠন কোষ। শেষোক্ত কোষগুলি কিন্তু দেহের বিশেষ অংশগঠনের জন্য নির্দিষ্ট নয় অথচ দেহের প্রয়োজনীয় বিশেষ অঙ্গের রূপ গ্রহণ করতে সমর্থ। এরা আলতোভাবে লেগে থাকা প্যারেন কাইমার ফাঁক দিয়ে অক্লেশে যাতায়াত করতে পারে। তাই টিকটিকির লেজের দিকটায় কোষগুলো দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ না থাকায় অল্পে যেমন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তেমনই অধিক পরিমাণে পুনর্গঠন কোষ থাকায় সেগুলো বিচ্ছিন্ন অংশের মাথায় জড় হয়ে বিভাজনের ফলে কয়েক দিনের মধ্যেই নষ্ট অঙ্গকে পুনর্গঠিত করে। অবশ্য গল্পের জরসন্ধ রাজা বা রাবণ রাজার মত সঙ্গে সঙ্গে হয় না, অন্ততঃ দিন আটেক সময় লাগে। জ্যান্ত একটা হাইড্রাকে নিয়ে কেটে ফাঁক করে অথবা টিকটিকিকে পালন করে তোমরা হাতে নাতে পরীক্ষাও করতে পার।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয় যে, উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীদের ভ্রূণের মধ্যে পুনর্গঠন কোষের সন্ধান লাভ করেছেন বিজ্ঞানীরা। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেছে, উন্নত জীবদের বেলায়

প্রথম থেকেই বিশেষ বিশেষ অঙ্গ গঠনের জন্য ব্যয়িত হয়ে যায়। উদ্বৃত্ত বড় একটা থাকেনা। তবে একেবারে যে থাকে না এমন নয়। হাড় জোড়া লাগা বা ক্ষতস্থান পুনর্গঠিত হওয়ার মূলে এদের ভূমিকা আছে। কিন্তু টিকটিকিদের লেজের দিকটায় বা প্ল্যানেরিয়া প্রভৃতির দেহে পুনর্গঠন কোষের পরিমাণ খুব বেশী। মানুষের দেহে যদি এমন কোষের পরিমাণ অধিক থাকত তাহলে কি মজাটা হতো তাই না? মাথার জন্য কেউ আর মাথা ঘামাতো না।

প্রঃ—রেগে গেলে মুখটা লাল হয়ে ওঠে কেন?

প্রশান্ত মিত্র কেশিয়াড়ী মেদিনীপুর।

উঃ—রাগ হওয়া মানে এক ধরণের আবেগের বশীভূত হওয়া। যে কোন আবেগের মূলে আছে মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস গ্রন্থি ও অন্যান্য কতকগুলো বিশেষ গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোনের ভূমিকা। কোন বিষয়কে অবলম্বন করে আমাদের মনের উপর চাপ পড়লে মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস গ্রন্থি তার নিয়ন্ত্রন ক্ষমতা হারায় এবং হরমোন নিঃসরণ ঘটে। আর তখনই মানুষ ভয় ক্রোধ, দুঃখ, আনন্দ হীনমন্যতা প্রভৃতি কোন না কোন আবেগের বশীভূত হয়ে পড়ে এবং অনেক সময় নানা অঘটনও ঘটিয়ে থাকে।

যে কোন আবেগের বশীভূত হওয়াটা অত্যন্ত খারাপ। আর রেগে গেলে তো কথাই নেই। হরমোনগুলোর প্রতিক্রিয়ায় হাতে পায়ের মাংসপেশী স্ফীত হয়ে ওঠে, ফুসফুসের আয়তন বৃদ্ধি পাওয়ায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে থাকে, মুখ কান লাল হয়ে ওঠে, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দ্রুত হয়, প্লীহা থেকে রক্তকোষ নির্গত হয় এবং রক্তে অক্সিজেনের পরিবহন বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় দেহের হয় প্রচণ্ড ক্ষয়। আর ঐ ক্ষয়কে পূরণ করতে গিয়ে যকৃত থেকে গ্লাইকোজেন নিঃসৃত হয়। অপরদিকে অন্যান্য কতকগুলো গ্রন্থি অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠার ফলে দেহের নার্ভাস সিস্টেমের উপর পড়ে প্রচণ্ড চাপ। তখন মস্তিষ্কে রক্ত চলাচলের মাত্রা ভয়ানকভাবে বেড়ে যায় এবং মুখমণ্ডলটা তাই লাল হয়ে উঠে।

এখানে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় যে, রাগ অথবা যে কোন আবেগের বশীভূত হওয়া অত্যন্ত খারাপ। আবেগ এত ভয়ঙ্কর যে, এর তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে কখনও কখনও মৃত্যুও পর্যন্ত ডেকে আনে এবং আত্মহত্যার মত জঘন্য কর্মে মানুষকে লিপ্ত করায়। তাই আবেগের বশীভূত কখনও হওয়া উচিত নয়। অবশ্য আবেগ আসবেই। আর তখনই আপন বুদ্ধিবৃত্তিকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে এবং মনে করতে হবে এটি হরমোনের প্রতিক্রিয়া ছাড়া অন্য কিছু নয়। তখনই সংযম আসবে এবং সংযম এলেই হরমোন নিঃসরণ বন্ধ হয়ে যাবে। অপরদিকে যে পরিস্থিতিকে অবলম্বন করে আবেগ উৎপন্ন হয়েছে সেই পরিস্থিতিকে জয় করতে হবে বুদ্ধি দিয়ে। তাহলে নিজে এবং নিজের সমাজ উভয়ই হয়ে উঠবে সুন্দর।

প্রঃ দিনের বেলায় আকাশের তারা দেখা যায়না কেন?

অভিজিৎ গাঙ্গুলী, তিলজলা কলিকাতা-19

উঃ দিনের বেলায় প্রখর সূর্যালোকের জন্য তারাদের দেখা যায়না। পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় কখনও কখনও প্রথম প্রভার তারারা দৃষ্টিগোচর হয়।

প্রঃ হীরক কী বিষাক্ত?

মৌসুমী কর্মকার, চাঁপাডাঙা হুগলী।

উঃ গল্প-উপন্যাসে পড়া যায় হীরক বিষাক্ত। কিন্তু হীরক তো কার্বন ছাড়া অন্য কিছু নয়! ও-বিষাক্ত হবে কেমন করে? কয়লা যে বিষাক্ত নয়, সেতো সবারই জানা।

প্রঃ তারা কী সত্যই খসে পড়ে?

সুশান্ত, শঙ্খ, প্রদীপ, শশধর ও **আপ্পু**—রামপুর হাট—বিবেকানন্দ রোড, বীরভূম। ও **দেবরাজ পাল,** বাকসাড়া-হাওড়া।

উঃ উল্কা পতনকে চলতি কথায় তারা খসা বলে। উল্কাপাত সম্বন্ধে যদি জানতে চাও তাহলে গত জানুয়ারীর ধূমকেতু সংখ্যাটি দেখ।

প্রঃ হ্যালির ধূমকেতুকে নেপচুনের পরিবারভুক্ত কেন ধরা হয়?

আকতারুজ্জামান, বর্ষনপুর-মুর্শিদাবাদ

প্রশ্নটির উত্তর কষ্ট করে গত জানুয়ারী সংখ্যা থেকে সংগ্রহ করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

প্রঃ সূর্য কি যুগল নক্ষত্র?

তন্ময় চৌধুরী, শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষালয়-হাওড়া।

উঃ বর্তমানে বিজ্ঞানীরা এই ধরণের একটা অভিমত-প্রকাশ করছেন।

সুধাংশু পাত্র

বাংলায় প্রকাশিত প্রথম ক্যুইজ বুকস সিরিজ সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত

শুধু প্রশ্নোত্তরের আসরে যাবার সাহসই আসবে না সেই সঙ্গে স্কুলের অনেক objective পরীক্ষার উত্তর দিতেও সুবিধা হবে। —*যুগান্তর*

সময় কাটানো ছাড়া অনুশীলন ও বুদ্ধিচর্চার প্রয়োজনে বইগুলি খুবই কাজের। এছাড়া প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতিতেও সব ক'টি বই সাহায্য করবে। —*দেশ*

Popularity of Quiz book to the belief that they groom students for Competitive Examinations
—*The Statesman*

আপনার ছেলেমেয়েদের বুদ্ধিদীপ্ত করে তোলার জন্যে এক্ষুণি এক সেট বই কিনে দিন

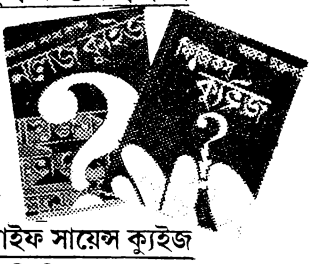

অমরনাথ রায় ।। কেমিস্ট্রী ক্যুইজ
অমরনাথ রায় ।। নলেজ ক্যুইজ
অলক চক্রবর্তী ।। ফিজিক্স ক্যুইজ
অমরনাথ রায় ।। সায়েন্স ক্যুইজ
অরূপরতন ভট্টাচার্য ।। গণিত ক্যুইজ
তারকমোহন দাস ও সীমা সেন ।। লাইফ সায়েন্স ক্যুইজ

প্রতিটি বই ১০ টাকা। দুটি বই একত্রে নিলে ভি পি চার্জ লাগবে না।

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৯

R/No 37390/81 KISHORE JNAN-BIJNAN 6th Yr Vol – 11· MARCH – 1987/Regd.No.WBEC/255

স্টুডেন্ট সায়েন্স এনসাইক্লোপিডিয়া

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক 86/1 মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-9 থেকে প্রকাশিত এবং 8A, দীনবন্ধু লেন, কলকাতা-6, নিউ জয়কালী প্রেস থেকে মুদ্রিত। প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-12।

দাম ঃ 4·00 টাকা।